আনাতোলি আলেক্সিন

ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা

১ম পরিচ্ছেদ, যাতে পরিচয় হবে কাহিনীর নায়কদের সঙ্গে, যারা সবাই অবশ্য নায়ক
উঠবে না — ৪র্থ পরিচ্ছেদ, যাতে পুরনো বাগান বাড়িতে যাত্রা শুরু হবে — ৬ষ্ঠ পরিচ্ছে
যাতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, আমার কাছে সবই অস্পষ্ট — ১০ম পরিচ্ছেদ, যাতে শো
যাবে তলকুঠরি থেকে চিৎকার — ১১শ পরিচ্ছেদ, যাতে আমরা নানারকম কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি
শুনব — ১২শ পরিচ্ছেদ, সবচেয়ে ছোটো ও সর্বশেষ পরিচ্ছেদ (এই কাহিনীতে!)

আনাতোলি আলেক্সিন

ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা

আলিক ডিটেকিনের ডিটেকটিভ কাহিনী

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইউ. ক্রানিন

А. АЛЕКСИН
ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
На языке бенгали

প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর পাঠকেরা!

বাঙলা ভাষায় নামকরা সোভিয়েত লেখক আনাতোলি আলেক্সিনের এই মজার বইটি তোমরা পেলে 'রামধনু' সিরিজের অংশ হিশেবে।

আগেই বেরিয়েছে:

সোভিয়েত ইউনিয়নের নানা জাতির লেখকদের গল্প-সংকলন 'বৃষ্টি আর নক্ষত্র'।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনকে নিয়ে লেখা কাহিনীগ্রন্থ 'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা'।

শীগগির বেরুবে:

প্রথম ব্যোমন্যাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিনের লেখা 'পৃথিবী দেখছি' (প্রামাণিক ফোটোগ্রাফ থাকবে তাতে)।

প্রবীণা শিশু সাহিত্যিক ল্যুবোভ্ ভরোন্কোভার 'যাদু তীর'। এতে থাকবে দুটি কাহিনী: মজার গল্প 'যাদু তীর' আর দেশপ্রেমিক মহাযুদ্ধের সময়কার একটি মেয়ের জীবন নিয়ে লেখা 'শহরের মেয়ে'।

তোমাদের কেমন লাগল জানতে পেলে আমরা খুশি হব। আমাদের ঠিকানা: প্রগতি প্রকাশন, জুবোভস্কি বুলভার, ২১, মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন।

আমার কিশোর পাঠকদের কাছে

আমার শেষ দিককার একটি কাহিনী শুরু করেছিলাম এই ভূমিকা দিয়ে: 'এ পথটা আমার ঠোঁটস্থ। ঠিক সেই কবিতার মতো যা কখনো মুখস্থ না করলেও সারা জীবন মনে থেকে যায়। চোখ বুজে আমি পাড়ি দিতে পারি পথটা, যদি অবশ্য ফুটপাথে লোক না থাকত, রাস্তায় না ছুটত বাস, মোটর গাড়ি।

'মাঝে মাঝে ছেলেপিলেদের সঙ্গে বেরই, সাত সকালেই তারা ছোটে রাস্তাটা দিয়ে... আমার মনে হয় এই বুঝি চার তলার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মা হাঁকবেন: 'টেবিলে তোর জলখাবার পড়ে রইল!' তবে আজকাল আমার অমন ভুল বড়ো হয় না, আর যদিই বা হয় চার তলা থেকে ডাকাডাকি করার মানেটা কী। আমি তো আর এখন স্কুলের ছেলে নই।

'মনে আছে একদিন আমার সেরা বন্ধু ভালেরির সঙ্গে কেন জানি মেপে দেখেছিলাম বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে কয় কদম লাগে। এখন আমার পদক্ষেপ দিতে হয় কম: পা তো বেড়ে গেছে। কিন্তু রাস্তাটা থেকে গেছে লম্বাই, কেননা এখন আর আগের মতো ছুটে ছুটে হাঁটি না। বয়স হলে লোকের পদক্ষেপ একটু মন্থর হয়ে আসে, আর যত বয়স বাড়ে তাড়াহুড়োর ইচ্ছে ততই কমে যায়...

'আগেই বলেছি, প্রায়ই সকালে ছোটোদের সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার এই রাস্তাটা দিয়ে হাঁটি। ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি... অবাক হয়ে যায় তারা: 'কাউকে খুঁজছেন? হারিয়ে গেছে কেউ?' সত্যিই তো, আমি যেটা হারিয়েছি সেটা তো আর ফিরে পাবার নয়, তবে ভোলবার জিনিসও নয়: সে আমার ইস্কুলের দিনগুলো।

'তবে, না — তারা শুধু স্মৃতি হয়ে নেই, তারা বেঁচে রয়েছে আমার মধ্যে।'

হ্যাঁ, অবিস্মরণীয় শৈশবের যা কিছু অপরূপ তা সবই বুকে করে রেখেছি।

যেমন মনে আছে, বছর দশ বয়সে আমি একটা মোটামতো উপন্যাস লিখে ফেলি। নির্ভয়

সব গোয়েন্দাদের কীর্তি-কাহিনী ছিল তাতে, ধূর্ত দুর্বৃত্তদের সমস্ত অপরাধ তারা ফাঁস করে। ডিটেকটিভ কাহিনী সেটা।

পরে শুরু করলাম কবিতা লিখতে। 'পাইওনিয়র প্রাভদা'য় তা প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির প্রচার-সংখ্যা প্রায় এক কোটি। ফলে দেশের নানা কোণের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। আমার কবিতা পড়ত তারা। চিঠি পাঠাত।

তারপর শুরু হল যুদ্ধ। কাজ নিলাম 'ক্রেপস্ত অবোরোনি' (প্রতিরক্ষার দুর্গ) পত্রিকায়। তখনো আমার আঠারো বছর হয় নি, আর দৈনিক পত্রটির দায়িত্বশীল সেক্রেটারির পদ নিতে হল; তবে যুদ্ধের সময় তো লোকে ঝট ঝট করে বেড়ে ওঠে! অ্যালুমিনিয়ম কারখানাতেও কাজ করেছি যেখানে 'ডানাওয়ালা ধাতুর' জন্ম হয় — বেপরোয়া জঙ্গী আর বোমারু বিমান হয়ে তা পরে আকাশ-যুদ্ধ চালিয়েছে হিটলারীদের সঙ্গে...

যুদ্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করি। ইচ্ছে ছিল কবিতা রচনা চালিয়ে যাব। কিন্তু একবার, একেবারে হঠাৎ লিখে ফেললাম ছোটোদের জন্যে তিন-পাতার এক গল্প। আমাদের বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সামুইল মারশাক সেটি পড়লেন (সেটাও হঠাৎ!) এবং বলে উঠলেন: 'আরে, আপনি যে শিশু সাহিত্যিক!' মারশাকের এ উক্তি মান্য করে আমি শিশু সাহিত্য রচনায় হাত দিলাম...

লেখাগুলো প্রধানত হাস্যরসের... কেউ কেউ ভাবে 'মজার' গল্প আর 'হালকা' গল্প বুঝি একই জিনিস। আসলে হাস্যরস, চিত্তাকর্ষকতা হল অতি গুরুতর সমস্যাকে কিশোরের চেতনায় পেঁাছে দেবার সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ।

আমার 'সাশা আর শুরা', 'সেভা কতলভের অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার', 'সাত তলা বলছি!', 'চিরন্তন ছুটির দেশ', 'কলিয়ার চিঠি ওলিয়াকে, ওলিয়ার চিঠি কলিয়াকে', 'একত্রিশ দিন' কাহিনীগুলি লেখার সময় আমি চেয়েছিলাম যেন আমার কিশোর পাঠক-পাঠিকারা তা পড়ে প্রাণ খুলে হাসে, সেই সঙ্গে জীবনের গুরুতর সমস্যার কথাও ভাবে।

তারপর... তারপর হঠাৎ একদিন মনে পড়ল আমার দশ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাসটির কথা। আরো একটি ডিটেকটিভ গল্প লেখার ইচ্ছে হল আমার, তবে নিজের নামে নয়, স্কুলের ছাত্র আলিক ডিটেকিনের নামে। লেখার সময় আমার প্রথম রচনাটির কথা মনে রাখতে চেয়েছি। আমার ছেলেবেলাকার মতো আলিক ডিটেকিনও গল্প লেখে একটু বীর রসের আধিক্য দিয়ে, ভাষার ঘনঘটা জমিয়ে। ৩৫ বছর আগে আমার যা মনে হয়েছিল, ওরও তেমনি মনে হচ্ছে, এতে রচনা হয়ে উঠবে 'খাঁটি' ডিটেকটিভ।

তবে 'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা'র মর্মবস্তুটা শুধু মজার নয়, গুরুত্বপূর্ণও বটে... অন্তত আমি চেয়েছিলাম তাই হোক। ইচ্ছেটা কি কাজে পরিণত করতে পেরেছি? তবে সে রায় তো দেবে তোমরা, আদরের পাঠকেরা। বইটা তোমাদের বিচারালয়ে সোপর্দ করলাম!

আনাতোলি আলেক্সিন

লেখকের কথা

নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে এক ইঞ্জিনিয়র সংসারে আমার জন্ম হয় ঠিক এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়। মিলমিশ পরিশ্রমী সংসার, আমি বাড়ির শেষ ছেলে। প্রথম ছেলে হল আমার দাদা কস্তিয়া। ছেলে বলতে আমরা মোট দুজন। কস্তিয়াকে অবশ্য এখন ছেলে বলা মুশকিল, কেননা সে আজকাল দাড়ি কামায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

বাপমায়েরা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন ভালোই; কস্তিয়া তো বিশ্ববিদ্যালয়েই যায়, আমিও ইশকুলে পড়ছি।

আমাদের দু'ভাইয়ের স্বভাব ছিল একেবারেই আলাদা। এখনো একেবারেই আলাদাই আছে, তাহলেও 'ছিল' বললাম এই জন্যে যে লেখকের কথা সবসময়ই লেখা উচিত অতীত কালে, স্মৃতি কথার মতো। দাদার ঝোঁক টেকনিকের দিকে, আমি ভালোবাসতাম ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস পড়তে। তারপর একটু বয়স বাড়তেই হঠাৎ নিজেরই লেখবার সখ হল।

ছোটোতে গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে সাহিত্য প্রীতি জাগাবার মতো কোনো বুড়ি আয়া আমার ছিল না, যেমন ছিল কবি পুশকিনের। মা নিজেই সংসারের কাজ করতেন, তাই আয়া বা ঝি আমাদের ছিল না।

তাহলেও ডিটেকটিভ গল্পের ভবিষ্যৎ লেখক হিশেবে আমার ওপর মস্ত প্রভাব ফেলেছেন আমার মা-বাবা।

আমি যখন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন মা আমার ইশকুলের জুতো রাখার থলিতে সেলাই করে দিয়েছিলেন আমার উপাধি 'ডিটেকিন'।

থলেটা খুবই সাধারণ, কিন্তু আমার জীবনে তার ভূমিকা অসীম! নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে লেখাটার শেষ দুই অক্ষর উঠে গিয়েছিল: হয়ত পচে গিয়েছিল সুতোগুলো, কিংবা হয়ত

এই জন্যে যে জ্বতো রাখার ঘরে মাঝে মাঝেই যে চরম লড়াই বেধে যেত অল্পক্ষণের জন্যে, তাতে জ্বতো রাখার থলিটা হত আমার হাতিয়ার। সে যাই হোক, আমার উপাধির মধ্যে টিকে রইল শ্বধ্ব প্রথম দ্বটি অক্ষর: 'ডিটে...'।

তা দেখে 'ডিটেকটিভের জ্বতো!' বলে চেঁচিয়েছিল একবার উঁচু ক্লাসের এক ছাত্র।

সেই শ্বর্ব: আমার ডাকনাম জ্বটল 'ডিটেকটিভ'। আর থলেয় মা যদি আমার উপাধি সেলাই করার কথা না ভাবতেন, তাহলে কি আর এটা হত?..

তবে মা-বাবার স্বপ্রভাব শ্বধ্ব এইটুকুনই নয়। প্রায়ই এ'রা আমার কাছ থেকে দলামোচড়া ডিটেকটিভ বই কেড়ে নিতেন। বলতেন, 'যত বাজে সময় নষ্ট করছিস!' পরে কিন্তু বইটা পাওয়া যেত হয় মায়ের বালিশের নিচে, নয়ত বা বাবার পোর্টফোলিওতে। এই ভাবে তাঁদের কল্যাণে আমি টের পেলাম যে সমস্ত স্বাভাবিক লোকই ডিটেকটিভ বই ভালোবাসে, তবে অনেকেই ভালোবাসে গোপনে। আর গোপন ভালোবাসা যে সবচেয়ে মনোহর আর জোরালো, সে তো সবাই জানে।

এই ভাবেই শ্বর্ব হল আমার রচনা। মা-বাপে ছিলেন বির্বদ্ধে: 'বাজে সময় নষ্ট!' তখন অতীতের যত বড়ো বড়ো শিল্পী, স্বরকার, লেখক বাপের ত্যাজ্য পত্র হয়েছিল বলে আমার জানা ছিল, তা বললাম। তাতে কাজ হল।

বাবা বললেন: 'বেশ, একটা বিদেশী ভাষা শেখা, কি হিতকর কোনো বই পড়া, বা ধরা যাক খেলাধ্বলায় যে সময়টা লাগাতে পারতিস, তা বাজে খরচে তোর যদি কষ্ট না হয়, তাহলে কর তোর যা খ্বশি। তবে আমিও একজন বিখ্যাত লোকের দৃষ্টান্ত দেব।'

এই বলে তিনি কবি লেরমন্তভের প্রথম খণ্ডটা নিয়ে দ্বটো কবিতা পড়ে শোনালেন। বললেন:

'এ কবিতা উনি লিখেছিলেন চোদ্দ বছর বয়সে। তুই এখন তার চেয়ে মাত্র দেড় বছরের ছোটো। মাত্র দেড়। আর যদি ধরি যে আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে, তাহলে বলতে হয় তুই সমবয়সী।'

'বেশ তো, কী হল তাতে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হল এই যে,' বললেন বাবা, 'আঙ্বল চুষে গল্প বেরয় না। লিখতে বসার আগে লোকের চরিত্র জানতে হয়। আর প্লট! সেটা আসে খাস জীবন থেকেই।'

নিজেদের বন্ধ্ববান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, মাস্টারদের চরিত্র অধ্যয়ন করতে লাগলাম আমি। তবে খাস জীবনটা আমায় কোনো প্লট জোগাতে চাইছিল না।

তারপর হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল...

সত্যিসত্যিই যা ঘটল তার চেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি ভাবতেও পারতাম না। আর তার আগাগোড়া সবটার রহস্য ভেদ করে প্রমাণ করলাম যে লোকে আমায় ডিটেকটিভ নাম দিয়েছে খামোকা নয়!..

১ম পরিচ্ছেদ

যাতে পরিচয় হবে কাহিনীর নায়কদের সঙ্গে, যারা সবাই অবশ্য নায়ক হয়ে উঠবে না

গত বছর যখন আমাদের ক্লাসে সাহিত্য চক্র গড়া হচ্ছিল তখন কেউ ভাবতে পারে নি তা থেকে কী ঘটবে। কী গোপন, ভয়াবহ একটা ঘটনা...

তবে আগেই লাফিয়ে না গিয়ে আমি সবটা পরপর বলে যাই, যদিও লাফিয়ে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে খুব। বইটা সব শেষ করলে আপনারা আমার কথা সহজে বুঝবেন...

যাই হোক, সবটাই শুরু হয় খুবই সাধারণ একটা ক্লাসে, সাধারণ একটা পাঠের সময়। ঘরটা চার দেয়ালে ঘেরা, শার্সি-দেওয়া বড়ো বড়ো দুটো জানলা দিয়ে দেখা যায় আঙিনা, আরেকটায় সরাসরি রাস্তা।

আমাদের ক্লাসের বিশেষ ভার পাওয়া নতুন মাস্টার স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন:

'যেখানেই আমি মাস্টারি করেছি, সেখানেই অবশ্য-অবশ্যই সাহিত্য চক্র থেকেছে। বিশেষ করে এখানে, এই ক্লাসে তা থাকা উচিত আরো বেশি, যেখানে পড়ছে গ্লেব বরোদায়েভ।'

সবাই আমরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম শেষ বেঞ্চির মাঝখানটায়: ঘাড় গুঁজে সেখানে বসে আছে শান্তশিষ্ট গ্লেব।

চরিত্রটির বয়স বছর তেরো। মুখের নরম মখমলী চামড়া তার প্রায়ই লাল হয়ে ওঠে। মাথায় লম্বা নয়, পড়াশুনায় মাঝারি, খুব ভালোবাসে কুকুর। খুবই সাধারণ গোছের দলামোচড়া প্যাণ্টটার দুই পকেট সর্বদাই ফুলে থাকে। অভিজ্ঞ চোখ নির্ভুল বলে দিতে পারবে যে তাতে আছে এক টুকরো রুটি কি সসেজ। গ্লেব তার প্রত্যেকটি প্রাতরাশ থেকে কুকুরের জন্যে কিছু না কিছু রেখে দেয় পকেটে। কুকুরেরাও সমান ভালোবাসত গ্লেবকে। আমরাও। শুধু কুকুর নয়, লোককেও ভালোবাসত সে। বিশেষ করে যদি কেউ বিপদে পড়ত। যেমন, পড়ে গিয়ে কারো যদি হাঁটুতে চোট লাগত, তাহলে গ্লেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বলত:

'এটা কী করে... তুই বড়ো হয়ে... আমি এক্ষুণি...'

উত্তেজিত হলে গ্লেব কখনো তার কথা শেষ করতে পারত না। বলতে গিয়েই সে থেমে যেত ঠিক একটা বিকল মোটর-ইঞ্জিনের মতো: গুর গুর করে উঠল, হঠাৎ থেমে গেল, আবার গুর গুর করে উঠল, আবার থেমে গেল... তবে আমরা জানতাম মিনিট খানেকের ভেতরেই গ্লেব এবার প্রথম তলায় ওষুধ ঘর থেকে আইওডিন নিয়ে আমাদের তলার হাত ধোবার কল থেকে রুমাল ভিজিয়ে ছুটে আসবে।

বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হত একটা কোমল হৃদয়।

'গ্লেব অবশ্য তোদের সকলের মতোই একজন ছাত্র,' বললেন স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ। 'তবে কিনা, ও হল লেখক বরোদায়েভের নাতি, যিনি এই আমাদের শহরেই এ শতকের প্রথমার্ধে লিখে গেছেন। গ্লেব যে ঠিক এই ইশকুলেই পড়ছে তাতে আমি খুশি। আমার ধারণা একটি

লেখকের ওপর বিশেষ মনোযোগ দিলে সমস্ত সাহিত্যেই আগ্রহ বাড়বে। গ্লেব এক্ষেত্রে আমাদের অমূল্য সাহায্য দিতে পারে!..'

ফের সবাই ফিরে তাকাল গ্লেবের দিকে... ওর দিকে মাত্র একজন তাকালেই সে সঙ্কোচে কুঁজো হয়ে যায়। এখন তো একেবারে ডেস্কের তলে সেঁধয় আর কি।

'সে কী করে...' আস্তে করে বললে সে, কথা শেষ করলে না, যেন পাশেই কারো হাঁটুতে চোট লেগেছে।

আমরা জানতাম যে আমাদের শহরে এক সময় গ্ল.বরোদায়েভ নামে এক লেখক ছিলেন। হলঘরে 'আমাদের শহরের নাম-করা লোক' শীর্ষক বোর্ডে তাঁর একটা ছবিও আছে।

হঠাৎ টনক নড়ল আমার: 'ওঁরও নাম তাহলে গ্লেব!' শুধু আমরা জানতাম না যে ওই গ্লেব আমাদের গ্লেবের আপন ঠাকুর্দা। আমাদের গ্লেব কাউকে সে কথা কখনো বলে নি।

কিন্তু স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ গুপ্ত রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন... এ চরিত্রটির বয়স বছর ঊনষাট (উনি বলেছিলেন যে আমরা যদি স্বভাবচরিত্র মোটেই না বদলাই, তাহলে এক বছর পর উনি আমাদের ছেড়ে পালাবেন পেনশন নিয়ে)। মাথায় লম্বা নন। চোখদুটো ক্লান্ত, গাল সবসময় মসৃণ করে কামানো থাকে না, সে গালের ফ্যাকাশে রঙেও একই রকম ক্লান্তির ছাপ। তবে বাইরের চেহারাটা ওঁর ছলনা, ভেতরটা কর্মোদ্যোগে ভরা।

'আমাদের চক্রটায় আমরা গ্লেব বরোদায়েভের নাম দেব!' বলে উঠলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ। চোখ থেকে ওঁর ক্লান্তি মুছে গেছে।

'সে কী করে...' পেছনের বেঞ্চি থেকে আস্তে করে বললে গ্লেব, 'আমারও তো নাম... কেউ কেউ হয়ত ভাববে... অন্য ক্লাসের কেউ...'

একটা কথাও ও শেষ করলে না, তার মানে ভয়ানক বিচলিত হয়েছে।

'আরো তো আছেন...' বলে গেল সে, 'কেন ঠাকুর্দা... ধরুন গোগল...'

'কিন্তু গোগলের নাতি তো আর আমাদের ক্লাসে পড়ছে না,' আপত্তি করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'পড়ছে বরোদায়েভের নাতি!'

সেই দিন থেকে গ্লেবের ডাকনাম জুটল 'বরোদায়েভের নাতি'। মাঝে মাঝে সংক্ষেপে 'নাতি' বলেও ডাকা হত।

সবখানেই ছেলেরা এক একটা ডাকনাম বার করতে ভালোবাসে। কিন্তু মাস্টাররা যা বলেন, আমাদের স্কুলে তা 'হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপজ্জনক মহামারী'। কিন্তু বিপদ এতে আছে-টা কী? আমার ধারণা, নামের চেয়ে ডাকনামে লোককে চেনা যায় অনেক ভালো। একটা মানুষ সম্পর্কে তার নামটা আদৌ কিছু বলে না। কিন্তু ডাকনামটা ঠিক করা হয় লোকটার স্বভাবচরিত্র দেখে। এইত, আমায় যদি শুধু আমার নামে, 'আলিক' বলে ডাকা হয়, তাতে কী বোঝা যাবে আমার সম্পর্কে? কিন্তু ডাকনাম — 'ডিটেকটিভ'! সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা যাবে আমি কী ধরনের লোক।

একটু আফসোস যে কিছু কিছু ছেলে নামটাকে খানিক গুলিয়ে ফেলে 'ডিটেকটিভের' বদলে চ্যাঁচায় 'ডিফেকটিভ'। সে রকম ক্ষেত্রে আমি অবিশ্যি সাড়া দিই না।

'চক্রের কাজ কিন্তু ক্লাসের পড়াশুনার মতো হওয়া চলবে না। কেউ সেখানে পড়তে আসবে না,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

সঙ্গে সঙ্গেই সবার ইচ্ছে হল চক্রে ঢুকবে। কিন্তু মাথা তুলল অপ্রত্যাশিত বাধা।

'চক্রের কাজ হবে সৃষ্টি,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'সাহিত্যিক প্রতিভাই হবে ঢোকবার সর্ত।'

দেখা গেল তেমন গুণ ক্লাসের প্রায় কারো নেই। কবিতা লিখত শুধু আন্দ্রেই ক্রুগলভ, ডাকনাম যার 'দিনেমার প্রিন্স', আর গেঙ্কা রীজিকভ, ডাকনাম 'মরকুটে'।

প্রথম দৃষ্টিতে ডাকনামগুলো একটু আশ্চর্য মনে হবে, তবে সে শুধু লঘুচিত্ত প্রথম দৃষ্টিতেই।

কেননা হ্যামলেটের সঙ্গে ক্রুগলভের এমনিতে কোনো মিল নেই। তাহলেও তাকে যে ঠিক দিনেমার প্রিন্স বলেই ডাকা হয় তার কারণ কবিতা সে লিখত স্কুলের বিভিন্ন দিন উপলক্ষে: শিক্ষাবর্ষ শুরুর দিন, শিক্ষাবর্ষ শেষের দিন, কারো জন্ম দিন, কারো মৃত্যু দিনে।

আমাদের স্কুলের যখন দশ বছর পূর্ণ হয়, তখন সে লেখে:

এই যে দিনে পালন করি
বিদ্যালয়ের জয়ন্তী,
ব্যাকুল হয়ে স্মরণ করি,
আনন্দ আজ অগুন্তি!

একবার ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল খোলার সময় পাইওনিওর নেতা আমাদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে প্রিন্সের কবিতা শুনিয়েছিল:

এই যে দিনে শুরু করছি
জ্ঞানবিদ্যার পথ যে,
ব্যাকুল হয়ে চেয়ে দেখছি
নীল আকাশের সূর্যে!

আর শিক্ষাবর্ষ শেষ হয়ে গ্রীষ্মের ছুটি হবার আগে দেয়াল পত্রিকায় দেখা গেল দিনেমার প্রিন্সের এই উচ্ছ্বাস:

এই যে দিনে ছেড়ে যাচ্ছি
বছর শেষে স্কুলের দ্বার,
ব্যাকুল হয়ে টের পাচ্ছি
চক্ষে অশ্রুজলের ভার...
নহে, নহে, দুঃখ তো নয়,
বিদায় নেবার ক্ষণটিতে
রইল হেথা মোদের হৃদয়
বিদ্যালয়ের বেঞ্চিতে!

স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ একবার বলেছিলেন যে সত্যিকারের কবি কখনো আদর্শচ্যুত হন না। দিনেমার প্রিন্সও কখনো একবারের জন্যেও তার আদর্শ ছাড়ে নি।

চরিত্রটির বয়স বছর তেরো। মাথায় লম্বা, কাঁধ চওড়া। দিনেমার প্রিন্স যদি জানত যে কারো বাড়িতে কোনো একটা শুভ ঘটনা ঘটছে, অমনি সে ছুটত খাতা পেনসিল নিয়ে কোনো একটা একলা কোণে, তারপর ফিরে এসে বলত:

'এই নে, মাথায় দু'একটা লাইন এসে গেল। হয়ত তোর ভালো লাগবে?'

কবিতার কাগজটা হাতে গুঁজে দিয়েই পালাত সে। গায়ে তার যেমন জোর, মনে মনে সে তেমনি বাচ্চার মতো লাজুক।

মনে পড়ছে একবার ওর কানে যায় যে আমার মা-বাবারা তাঁদের বিবাহ বার্ষিকী পালন করবেন। টিফিনের সময় দিনেমার প্রিন্স আমার কাছে এসে কাগজ গুঁজে দিয়ে বললে:

'এই নে, কয়েকটা লাইন খেলে গেল মাথায়। হয়ত তোর ভালো লাগবে!'

বলেই পালাল। কাগজে লেখা ছিল:

এই যে দিনে মাতাপিতাকে অহো
প্রণাম করে ভাবিস বসে একা,
জীবন নাট্য হত কী ভয়াবহ,
যদি তাঁদের না হত কভু দেখা!
বিয়ে তাঁদের না যদি হত তবে
আলিক রে, তোর জন্ম হত না ভবে!

বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হত মহানুভব এক হৃদয়!

বইয়ে আমি পড়েছি যে কবির সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব হয় প্রায়ই: দেলভিগের সঙ্গে পুশকিনের, গ্যেটের সঙ্গে শিলারের... দিনেমার প্রিন্সও বন্ধুত্ব করত মরকুটের সঙ্গে।

মরকুটে লিখত প্রেমের কবিতা... চরিত্রটির বয়স বছর তেরো। মাথায় লম্বা নয়, কাঁধ চওড়া নয়, মুখটা মড়ার মতো ফ্যাকাশে। এবং মোটের ওপর সে খুবই মরতে চাইত।

মানে হয় না বাঁচার,
সন্দেহ তায় কিছু মাত্র নাই!
হৃদয় জ্বলে পুড়ে হল ছাই,
যখন উঁচু ক্লাসের ছেলেটার
দিকেই গেলে পরে সোয়েটার।

কবিতাটার শিরোনামা হিশেবে লেখা ছিল শুধু দুটি আদ্যক্ষর: অ. হ.।

আর যে কবিতাটার আবৃত্তি হয় স্কুলের দোতালায় আমাদের শৌচাগারে, সেটা এই:

মরণ, মরণ, মরণ!
হেরিবে না তাহে নয়ন

কোট রাখবার হলঘরে
চলে যাও কাকে সাথে ক'রে...

এটার শিরোনামাতেও দুটি অক্ষর: আ. স.।

জানতে আমাদের ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল কার জন্যে মরকুটে অমন ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছে। ক্লাসের রেজিস্টার থেকে আমরা সব যাচাই করে দেখলাম। কিন্তু আমাদের ক্লাসের কোনো মেয়ের নামই ওই ধরনের আদ্য অক্ষর দিয়ে নয়।

'হয়ত অন্য কোনো ইশকুলের?' কে একজন যেন বললে।

হঠাৎ আমার মাথায় ঝলকে উঠল:

'উঁহুঁ! দু'জনেই ওরা আমাদের ইশকুলেরই। নইলে সোয়েটার পরে অ. হ. যে উঁচু ক্লাসের ছেলেটার দিকেই গেল, আর আ. স. অন্যের সঙ্গে ওভারকোট রাখবার হলঘরে নামল, তা ও দেখল কেমন করে!'

'ঠিক কথা... খাঁটি ডিটেকটিভ: যুক্তি মিলিয়ে ভাববার কী ক্ষমতা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সবাই।

শুধু দিনেমার প্রিন্স বললে:

'মরকুটের পেছনে লাগবি না!.. যে লাগবে, আমার সঙ্গে তার এক হাত হয়ে যাবে।'

আর যেমন তার গায়ে বল, তেমনি বাচ্চার মতো মুখচোরা হলেও সবাই জানত, মরকুটের কোনো ক্ষতি সে সইবে না। মরকুটের ও ভক্ত, কেননা নিজে সে প্রেমের কবিতা লিখতে পারত না।

একবার সে উচ্ছ্বাস করে বলেছিল, 'শুধু এইটেই হল আসল কবিতা! নাম-করা সমস্ত কবিই ছোটো থেকেই প্রেমের কবিতা লিখেছে। প্রতিভার কদর করা উচিত!'

এই হল তার এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য: অন্যের জন্যে উচ্ছ্বাস।

'তুই তাহলে কেন নানারকম দিন নিয়ে কবিতা লিখিস?' জিজ্ঞেস করলাম আমি প্রিন্সকে।

'প্রশংসার কথা শুনতে যে লোকের ভালো লাগে... বিশেষ করে তাতে যদি ছন্দ আর মিল থাকে,' বললে সে।

'আর প্রেমের কবিতাও তুই লিখিস!'

'তা লিখতে হলে আগে প্রেমে পড়ে বুঝতে হয়,' বললে দিনেমার প্রিন্স। 'মরকুটের সে সৌভাগ্য আছে, আমার এখনো নেই।'

সৌভাগ্যটা মরকুটের ঘটল তৃতীয়বার। বরাবরই সে কেমন উদাস উদাস ভাব করে দিন কাটাত। শেষ দিককার সমস্ত কবিতাই সে উৎসর্গ করতে লাগল কে এক ই. ষ.'র উদ্দেশে। মেয়েটা এখনো অবশ্য অন্য কারো সঙ্গে ওভারকোট রাখতে হলঘরে যায় নি, তাহলেও মরকুটের মরার ইচ্ছে কমল না:

একটু নরম কথা তোমার,
একটুখানি দৃষ্টি পেতে,

মরতে রাজী, হৃদয় আমার
গোলার মতো ফাটিয়ে দিতে

আমি সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম:

'বল-না, কে এই ই. ষ.?'

'সেটা একটা বিকট ব্যাপার হবে না?'

'কীসের... বিকট ব্যাপার?'

'নামটা আমি ফাঁস করতে পারি কখনো?'

'কেন পারিস না?'

'মাথায় ঢুকছে না তোর?'

ওই হল ওর এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য, প্রশ্নের জবাব দেয় প্রশ্ন করে।

'কিন্তু কেন না?'

'পুরুষ মানুষ কি কখনো তা পারে?'

রোগা পটকা ওর বক্ষপিঞ্জরের মধ্যে স্পন্দিত হত একটা উদগ্র হৃদয়।

সাহিত্য চক্রে সঙ্গে সঙ্গেই ঠাঁই মিলল প্রিন্স আর মরকুটের।

ভালিয়া মিরোনভা বললে সেও ঢুকতে চায়।

সুন্দরীটির বয়স সাড়ে বারো বছর, শণচুলো। মানে, গত বছর যখন চক্র গড়া হচ্ছিল তখন আমরা সবাই ছিলাম এক বছর ছোটো... কিন্তু যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা আমি বলতে চাই, তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

মিরোনভা ছিল আমাদের ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে শণচুলো আর সবচেয়ে উদ্যোগী এক পড়ুয়া। মনে হবে যেন সব সময় ও শুধু একটি কথাই ভাবছে, কী করে বেশি কাজ দেখাবে।

শিক্ষয়িত্রী যদি বাড়িতে কষার জন্যে পাটিগণিতের সাতটা অঙ্ক দেন, মিরোনভা নির্ঘাৎ হাত তুলে বলবে:

'আর আটটা যদি করি?'

দ্বিতীয় শিক্ষয়িত্রী যদি বাড়িতে লেখার রচনা আনতে বলেন চারদিনের মধ্যে, মিরোনভা হাত তুলে বলবে:

'আর তিনদিনের মধ্যে যদি আনি?'

কোনো লোকের কথা যখন কেউ ভাবে, তখন তার সবচেয়ে স্বাভাবিক পোজেই তাকে কল্পনা করে। যেমন, গ্লেব বরোদায়েভের কথা ভাবলেই মনে হবে তার হাঁ-করা পকেট থেকে সসেজের স্যাণ্ডউইচ বার করে কুকুরকে খাওয়াচ্ছে; দিনেমার প্রিন্স তার তাগড়াই শরীর আর শক্তি সত্ত্বেও লাজুকের মতো কবিতার একটা পাতা গুঁজে দিচ্ছে, যেটা হয়ত কারো ভালো লাগবে; করিডর দিয়ে মরকুটে হাঁটছে ফ্যাকাশে মুখে, মরণের স্বপ্ন দেখছে... আর মিরোনভাকে আমি সর্বদাই কল্পনা করি হাত-তোলা অবস্থায়: যতটা দরকার তার চেয়েও বেশি কিছু করতে চায় সে। পলিক্লিনিকের ডাক্তার যদি বলেন, 'দশটা ইনজেকশন নিতে হবে তোমায়!' — তাহলে, আমার

ধারণা, মিরোনভা নিশ্চয় বলবে, 'আচ্ছা, এগারোটা যদি নিই?'

স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ সাহিত্য চক্রের কথা ঘোষণা করা মাত্র মিরোনভা হাত তুলে বললে:

'আমিও ঢুকতে চাই।'

'কী জিনিস লিখবি তুই?'

'যা বলবেন...' জবাব দিলে মিরোনভা।

ওই হল ওর এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য: সব সময় আজ্ঞা মেনে চলা।

স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন: 'কবিতা হল অনুভবের এলাকা, সেখানে খুঁটিনাটির জ্ঞান থাকতেই হবে এমন নয়। গদ্য কিন্তু অন্য ব্যাপার। গদ্যে লেখা উচিত সেই জিনিসটে যা সে সবচেয়ে ভালো জানে। আর রোজ তুই কী দেখিস মিরোনভা? স্কুলে, ক্লাসে, হোমটাস্কে, পাড়া-প্রতিবেশী, আর সহপাঠীদের মধ্যে? তাই নিয়ে লেখ্। যেমন প্রথমে শুরু করতে পারিস: 'আমার সকাল', 'আমার সন্ধ্যা' ধরনের সাহিত্যিক স্কেচ নিয়ে...'

মিরোনভা হাত তুলে জিজ্ঞেস করলে:

'যদি লিখি 'আমার দিন'? তাতে তো সকাল, সন্ধে, দুপুর — একসঙ্গে সবকটাই হয়ে যাবে।'

এখানেও তার বেশি কাজ দেখাবার ইচ্ছে।

'বেশ তো,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'তাই যদি তোর ইচ্ছে, আপত্তি করব না। সেই যে মায়াকোভস্কি যা বলেছেন, নিজের গানের গ্রীবা পদদলিত করে লাভ কী! তবে খুঁটিনাটি বর্ণনা চাই বেশি করে। তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তিতে সব জেনে নিস। লেখাটা নিয়ে আসিস দিন পাঁচেক পর।'

'আর যদি চারদিন পরে আনি? কিংবা তিনদিন?' জিজ্ঞেস করলে মিরোনভা তার হাতটা তুলে। ওই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে, এমন কি করিডরে বা রাস্তায় কারো সঙ্গে কথা বলার সময়ও সে ঠিক ক্লাসের মতোই হাত তুলবে নির্ঘাৎ।

তিনদিন পরে সে তার স্কেচ নিয়ে এল — 'আমার দিন'। শুরুটা সে করেছে এই রকম:

স্থানীয় সময় অনুসারে সকাল সাতটা দশ মিনিটে আমি উঠলাম। হাত মুখ ধুলাম রান্নাঘরে, কেননা বাথরুমে মুখ ধুচ্ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের রান্নাঘরে দুটি টেবিল, কেননা ফ্ল্যাটে থাকে দুটি পরিবার, প্রতি পরিবারের একটি করে টেবিল। দুটি জানলা রান্নাঘরে, একটি রাস্তার দিকে, অন্যটি আঙিনার দিকে। স্থানীয় সময় অনুসারে সাতটা তিরিশ মিনিটে আমি একটি আধসেদ্ধ ডিম, একটি পনীর স্যাণ্ডউইচ আর চিনি দিয়ে এক গ্লাস চা খেলাম। এই ভাবেই শুরু হল আমার খাটুনির দিন...

স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ মিরোনভার তারিফ করলেন:

'অনেক খুঁটিনাটি আছে বটে, যা শুধু একলা তোরই জানা!'

সাহিত্য চক্রে ভর্তি হল মিরোনভা।

'কিন্তু এরপর কী নিয়ে লিখবি?' জিজ্ঞেস করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

'যা বলবেন...'

বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হত একটা লক্ষ্মীমন্ত বাধ্যশিষ্ট মেয়েলী হৃদয়।

ভর্তি হল তিনজন। কিন্তু সংখ্যাটা কম। তখন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন নাতাশা কুলাগিনাকে চক্রে নেওয়া হোক।

এটি হল আমাদের ক্লাসের একটি অপূর্ব মেয়ে। সারা স্কুলে! বলতে কি, সারা শহরে! মাথায় সে ঠিক যতটা দরকার ততটাই লম্বা... তবে সে তো না বললেও চলে!

জন্ম থেকে আমি কখনো উড়ু-উড়ু করি নি, আনমনা ভাব টাব আমার মোটেই নেই। উল্টে বরং আমার ওই এক প্রচন্ড বৈশিষ্ট্যই হল একনিষ্ঠা। নাতাশাকে আমার ভালো লেগেছে সেই প্রথম শ্রেণী থেকেই। মেয়েলী মাধুর্যে সে ভরপুর। ইণ্টারভ্যালগুলোর সময় চারিদিক থেকে মেয়েরা তাকে ছেঁকে ধরত; সবাই চাইত তার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বারান্দায় পায়চারি করতে। তাতে আমার সুবিধে হয়েছিল: আমার সঙ্গে যদি পায়চারি না করে, তাহলে অন্তত মেয়েগুলোর সঙ্গেই করুক, অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে তো নয়।

মোটা একটা খাতায় ন্যাতাশা প্রায়ই কী সব টুকে রাখত। স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ তাকে যখন সাহিত্য চক্রে ডাকলেন, নাতাশা বললে:

'আমি সাহিত্য করি না, স্রেফ মনে যা হয় টুকে রাখি। নিজের জন্যে। কখনো একটা ফিল্ম, কি একটা বই নিয়ে... এই আর কি...'

'ব্যাপারটা দারুণ তো,' ভারিক্কি চালে বললে মরকুটে, 'ক্লাসের রচনাও তো তুই সব সময় লিখিস নিজের মতো করে, মৌলিক।'

'মরকুটের পেনু দৃষ্টিপাত, মুমূর্ষুর শুভ আশীর্বাদ!' বিরক্তি না চেপেই পুশকিনের লাইনদুটো চালিয়ে দিলাম আমি।

মরকুটে যে নাতাশার প্রশংসা করবে, সেটা আমার ভালো লাগল না। ন. ক. আদ্যাক্ষর নিয়ে তার নতুন কবিতা আবার না বেরয়, তাহলেই হয়েছে!

'বইপত্র নিয়ে? ফিল্ম নিয়ে?' ফের জিজ্ঞেস করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ। 'তার মানে, তোর মাথাটা সমালোচকের মাথা! দিব্যি ভালো কথা। আমাদের দরকার নানা শাখার সাহিত্য। গদ্য আর কবিতা আছে। এবার সমালোচকও মিলল। চক্র সদস্যদের রচনার সমালোচনা করবি তুই। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে যদি কমরেডদের ত্রুটি তোর চোখে পড়ে...'

'কিন্তু আমি যে শুধু আমার নিজের মনের ভাবনাগুলো টুকে রাখি — ওসব আবার লোককে শোনাতে হবে নাকি?'

'নিজের মনের কথা নাই বা শোনালি,' উপদেশ দিলে মিরোনভা, 'স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ যা বলবেন তাই লিখবি। অন্য লোকের পরামর্শও নিবি। পাঠ্য পুস্তকে দেখবি কী লেখা আছে।'

কিন্তু সে কথা যেন নাতাশার কানেই গেল না।

'উ'হু, পরের লেখার সমালোচনা করতে পারব না,' বললে নাতাশা, 'এমনি মুখোমুখি পারা যায়, কিন্তু ওভাবে সভার মধ্যে... ও আমি পারব না।'

'প্রথম প্রথম শুধু শুনে যা,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'তারপর দেখিস, সৃজনের বন্যা তোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার খাত বেয়ে!'

নাতাশা অবিশ্যি যা খুশি তাই করতে পারত, কেননা ক্লাসের মধ্যে সে সবচেয়ে সুন্দরী। তাহলেও দ্যাখো, সকলের সামনে অন্যের সমালোচনা করতে সে রাজী নয়। বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হত একটা অপূর্ব হৃদয়!

মিনিট দশেকের মধ্যে আমিও সাহিত্য চক্রে ভর্তি হবার আর্জি জানালাম।

'তুইও তোর সাহিত্য শক্তি পরখ করতে চাস?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

'আমি লিখতে চাই ডিটেকটিভ নভেল...'

'ধাপ ডিঙিয়ে লাফ?'

'তার মানে?'

'দরকার ক্রমে ক্রমে করা। প্রথমে স্কেচ, তারপর গল্প, তারপর নভেল। তবে তোর গানের গ্রীবা পদদলিত করতে চাই না। এর মধ্যে কিছু লিখেছিস?'

'ভূমিকাটা লিখেছি... তাছাড়া ছক করেছি কিছু-কিছু।'

এ সবই আমি দেখাই প্রথমে বাবাকে, তারপর স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচকে। তখনো ধারণাই করি নি কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে অচিরেই, তাই ভূমিকায় তার কোনো উল্লেখ ছিল না।

'তোর চরিত্র বর্ণনাগুলো খানিকটা একঘেয়ে,' বললেন বাবা, 'বিশেষণগুলো খুব চড়া। ওটা সাবেকী কায়দা। আজকাল ও ভাবে কেউ লেখে না। ওটা আর ফ্যাশন নয়।'

'কিন্তু ফ্যাশনও তো বদলায়,' আপত্তি করলে আমার দাদা কস্তিয়া, 'আগে পরত লম্বা কোট, তারপর খাটো, এখন আবার পরছে লম্বা।'

কোটের ব্যাপারগুলো কস্তিয়া সত্যিই বোঝে বটে। বাড়ির মধ্যে ও ছিল ফুলবাবু।

'তা ঠিক,' বললেন বাবা, 'ফ্যাশন জিনিসটা চঞ্চল। তাছাড়া এই তো হাতে খড়ি। প্রথম পিঠেটা তো পোড়াই হয়...'

আমার প্রথম 'পিঠেটা' কিন্তু স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচের ভারি ভালো লাগল।

'কোথাও কোথাও তুই একটু বীর রস অনুসরণ করেছিস। স্টাইলের দিক থেকে অবিশ্যি,' বললেন তিনি, 'কেউ কেউ বলতে পারে যে ওটা আধুনিক নয়...'

'কিন্তু ফ্যাশন জিনিসটা তো চঞ্চল!' বললাম আমি।

'নিঃসন্দেহে। তাছাড়া তোদের কোনো গানেরই গ্রীবা পদদলিত করতে আমি চাই না। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিতে তুই অনেক কিছু ধরেছিস। তাহলে আর কি... সাহিত্য চক্রে কত জন হল?..'

'পাঁচজন সদস্য!' চটপট হাত তুলে বললে মিরোনভা।

'না, চক্রে থাকবে ছয়জন সদস্য,' সংশোধন করে দিলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'পাঁচজন সাধারণ সদস্য, একজন সম্মানী — বরোদায়েভের নাতি!'

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচের ক্লান্ত চোখ আর ফ্যাকাশে সেই গালটা যা সর্বদা নিখুঁত করে কামানো থাকে না। তিনি জানতেন না কী ভয়াবহ ঘটনা এর পরিণাম!..

তবে তখন মনে আমার শঙ্কার চিহ্ন মাত্র ছিল না। অশুভ কোনো কিছুর এতটুকু ছায়াপাতও কোথাও দেখি নি।

নাতাশা কুলাগিনার সঙ্গে এক চক্রে থাকব, এই ভেবেই আমি খুশি হয়ে উঠলাম শিশুর মতো। আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলাম।

২য় পরিচ্ছেদ

যেখানে লক্ষ্যে না পড়লেও অমোঘভাবে ভয়ঙ্কর ঘটনার চুপিসারে সঞ্চার ঘটবে

হায়, কী লঘুচিত্ত, তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তই না আমরা করে বসি!

আমার বরাবর ধারণা ছিল যে কোনো একটা কিছুর সম্মানী সদস্য হল এমন সদস্য যে অন্যান্য সদস্যদের দায়িত্ব একেবারে পালন না করলেও পারে। সাংঘাতিক ভুল ধারণা।

ক্লাসে 'বরোদায়েভ কোণ' সংগঠনের ভার পড়ল ঠিক গ্লেবের ওপরেই।

'আমার, মানে... নিজে তো আমি... কাজটা তেমন...' কথা শেষ না করেও আপত্তি জানাল গ্লেব।

'বাজে কথা!' গর্জন করলেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'ভুল সিদ্ধান্ত! বড়ো বড়ো লোকের ছেলেমেয়ে নাতিনাতনিরাই তাঁদের স্মৃতিকথা লেখে, তাঁদের নিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও সমাপ্তিতে প্রধান অতিথি থাকে। আসল কথা, স্মৃতিকে সম্মান করে। তারা ছাড়া সম্মান করার দায় কাদের?'

তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি টের পেলাম যে গ্লেব স্মৃতিকথা লেখায় মোটেই উৎসাহী নয় এবং মোটের ওপর কেমন যেন উদভ্রান্ত বোধ করছে।

তাহলেও একটা ফোটোগ্রাফ আনল সে, তাতে তার দাদুর পূর্ণায়তন ছবি।

ছবিটা যাঁর তাঁর বয়স ষাটও হতে পারে সত্তরও হতে পারে। কেননা তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি অনেক আগে থেকেই জানি যে অল্প বয়সে লোকের চেহারা বছরে বছরেই বদলায়, কিন্তু বয়স্ক লোকদের বয়স স্থির করা কঠিন। মাথায় ইনি লম্বা নন, কাঁধ চওড়া নয়।

'প্রায় সমস্ত নামকরা লোককেই জীর্ণশীর্ণ দেখায়,' ব্যাখ্যা করে বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'প্রকৃতির দান যায় কেবল হয় পেশীতে, নয় মস্তিষ্কে। দুদিকটা কুলিয়ে ওঠা তার হয় না।'

বরোদায়েভের দাড়ি না থাকলেও মোচ ছিল।

'নিজের উপাধির কথা ভেবে লেখক নিশ্চয় বড়ো দাড়ি রাখতে পারতেন,'* বললেন স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'কিন্তু সর্বনিম্ন প্রতিরোধের পথ নেন নি তিনি। এই থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে তিনি গুরুত্ব দিতেন বাইরের জিনিসের ওপর নয়, শুধু ভেতরটায়, অর্থাৎ ঘটনার মর্মার্থে, তার গভীরতা, তার মূলটা দেখতেন।'

'বরোদায়েভ কোণটা' ঠাঁই নিল ব্ল্যাক বোর্ড আর জানলার তাকটার মাঝে। তাগড়াই দিনেমার প্রিন্স একাই বয়ে আনল প্রকাণ্ড এক প্লাইউডের স্ট্যাণ্ড।

মাঝখানটায় লাগানো হল লেখকের ছবি, তার নিচে জন্ম-বৎসর, তারপর একটা ড্যাশ দিয়ে মৃত্যু-বৎসর। ড্যাশটা ছোটো, যদিও বরোদায়েভ বেঁচে ছিলেন অনেক দিন, মারা যান তিরাশি বছর বয়সে।

স্ট্যাণ্ডে রইল লোকান্তরিত লেখকের প্রিয় পুস্তক, এগুলোও বাড়ি থেকে এনে দিয়েছিল গ্লেব। প্রত্যেকটার মলাটেই বেগুণী স্ট্যাম্প: 'গ্ল. বরোদায়েভের নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে'।

দেখা গেল, লেখক ডিটেকটিভ বই-ও ভালোবাসতেন। আর তার জন্যে তাঁর লজ্জাও ছিল না। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম, বক্ষপিঞ্জরে ওঁর স্পন্দিত হত মহানুভব একটা হৃদয়।

খোদ গ্ল. বরোদায়েভেরও বই ছিল সেখানে। তাতেও বেগুণী কালির স্ট্যাম্প মারা। অভিজ্ঞ চোখ নির্ভুলভাবেই বলে দেবে লেখকের কোন বইটা সবাই পড়তে নিত বেশি করে। নামটা আমায় শিউরে দিয়েছিল: 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য'।

'ডিটেকটিভ?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম গ্লেবকে।

সায় দিয়ে সে মাথা নাড়লে।

'আমায় পড়তে দে...'

'কিন্তু এটা যে প্রদর্শনীর জিনিস!' বাধা দিলে কাছেই দাঁড়ানো মরকুটে। তারপর আলস্যে ইঙ্গিত করলে মিরোনভার টাঙানো প্ল্যাকার্ডটার দিকে: 'হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা বারণ!'

'তোর তাতে কী?' মরকুটেকে জবাব দিলাম বিরক্তি না চেপেই। ফের গ্লেবকে বললাম: 'শুধু একটি রাতের জন্যে!'

'বেশ, নে,' বেশ স্পষ্ট করে জোর গলায় বললে গ্লেব, যা কখনো সে বলে নি।

আমার মনে হল, ও যে কাউকে অনুমতি দিতে পারে, নিষেধও করতে পারে, তাতে ও তৃপ্তি পাচ্ছে। পরে খেয়াল হল: 'উঁহু, মুখে যে ওর অমন গর্ব ফুটেছে, তার কারণ আমি ওর দাদুর বই পড়তে চাইছি। সে তো স্বাভাবিক!'

নভেলটা আমায় মুগ্ধ করলে। ভূমিকায় লেখা ছিল যে এটি 'গ্ল. বরোদায়েভের শেষ দিককার রচনা'। তার মানে বুড়ো বয়সে উনি হঠাৎ ডিটেকটিভ গল্পের ভক্ত হয়ে ওঠেন। আর আমার মা-বাপে বলতেন কিনা ডিটেকটিভ গল্পের নেশাটা কেবল 'ছেলেমানুষি'। ওহ্, কী লঘুচিত্ত, তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তই না আমরা করে বসি!..

---

* রুশ ভাষায় 'বরোদা' মানে দাড়ি, তাই বরোদায়েভ উপাধি দাড়ির কথা মনে পড়ায়।

হ্যাঁ, 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য' আমায় অভিভূত করলে। খুন আর তদন্ত — শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের এই যা কিছু আমায় টানে তা সবই ছিল সেখানে।

শীতকালে বাগান বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করলে একটি লোক। একেবারে হাওয়া হয়ে গেল, যেন কদাচ ছিলই না সে! ঘটনাটা ঘটে রাত্রে। ঠিক নববর্ষের আগে। সমস্ত দরজা জানলা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। সকালে বরফের ওপর কোনো পদচিহ্নও দেখা গেল না। তিনশ সাড়ে তেইশ পাতা ধরে উধাও লোকটার সন্ধান চালাল তদন্তকারী, কুকুর আর আত্মীয়স্বজনেরা। কিন্তু সব বৃথা... আমি যত ডিটেকটিভ বই পড়েছি, তার মধ্যে শুধু এই একটিতেই দেখলাম অপরাধী ধরা পড়ল না।

পরিশেষে লেখা ছিল: 'এই ভাবে অপরাধীর সন্ধান মিলল না, কিন্তু প্রকাশ পেল লেখকের সৃজনী মৌলিকতা। বাঁধা পথে তিনি যান নি। রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর যেমন বাগান বাড়িটার কাছে কোথাও অন্য লোকের পায়ের ছাপ মেলে নি, কাহিনীতেও তেমনি 'অপরের পদচিহ্ন' নেই... 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য' রহস্যই থেকে গেল। তবে চিন্তা করার একটা উপলক্ষ পেলেন পাঠকেরা!'

আমিও দিন কয়েক ধরে চিন্তা করতে লাগলাম।

গ্লেব বললে, দাদু যে বাগান বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানেই তাঁর শেষ জীবনটা কাটে।

'ডিটেকটিভ গল্প লেখার পর্বটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, না, ডিটেকটিভ বই লিখেছেন এই একটিই... আর কোনো ডিটেকটিভ গল্প উনি লেখেন নি... এইটেই তাঁর শেষ বই...'

'মরাল সঙ্গীত!' পাশ থেকে বলে উঠল মরকুটে। অন্যের আলাপে নাক গলাতে সে ভালোবাসে।

'বাগান বাড়িটায় একবার গেলে হয়!' বলে উঠলাম আমি।

'মাত্র একঘণ্টা... যদি ট্রেনে যাস...' বললে গ্লেব।

'অকুস্থলে অভিযান?' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল মরকুটে। খুন জখমে তার উত্তেজনা হয় না, ও শুধু মরণের কথা ভাবতেই অভ্যস্ত।

স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন যে 'বরোদায়েভ কোণটাকে' পারিবারিক ফোটোগ্রাফ দিয়ে সাজানো দরকার।

পরের দিন গ্লেব একটা পুরনো ফোটো আনল, বরোদায়েভের মোচ তাতে প্রায় মুছে গেছে, মুখ হয়ে উঠেছে হলদে। উনি মাঝখানে ব'সে, চারিদিকে অন্য কে সব লোক। স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ জিজ্ঞাসা করলেন লোকগুলো লেখকের কে হয়। গ্লেব তা জানত না।

'এবার আমাদের চক্র সাহিত্যিক গবেষণাতেও নামবে!' সোল্লাসে বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'বাড়ি থেকে খোঁজ নে, পারিবারিক ফোটোগ্রাফের এই লোকেরা কারা।'

দিন কয়েক পরে ফোটোগ্রাফটার ঠাঁই হল স্ট্যান্ডে, তার তলে লেখা: 'আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে লেখক গ্র. বরোদায়েভ। বাম থেকে ডাইনে—লেখকের প্রতিবেশী, প্রতিবেশিনী (প্রতি-

বেশীর স্ত্রী), লেখকের শ্যালক, লেখকের শালাজ, লেখকের বাল্যবন্ধু, লেখকের বাল্যবন্ধুর স্ত্রী (দ্বিতীয়া), বাল্যবন্ধুর কন্যা, বাল্যবন্ধুর পুত্র, বাল্যবন্ধুর পৌত্র...' গ্লেব যে সাহিত্যিক গবেষণা চালিয়েছিল, এটা তার ফল।

'কিন্তু তুই-টা কোথায়?' গ্লেবকে জিজ্ঞেস করল মিরোনভা, পারিবারিক স্মৃতিদ্রব্যগুলোয় তলালিপি লেখার ভার পেয়েছিল সে। হাতের লেখা তার সবচেয়ে ঝরঝরে আর সুন্দর।

'আমি দাদুর সঙ্গে কখনো... আমি তখনো ছোটো...' বললে গ্লেব।

'তুই একটা কী রে?' সখেদে বললে মিরোনভা, 'ঈস, তুই যে কী!'

পরের দিন গ্লেব একটা ছবি আনল, যাতে সে কে একটা লোকের পাশে বসে আছে দোলনায়। অভিজ্ঞ চোখে লোকটার সঙ্গে গ্লেবের চেহারার মিল ধরা পড়বে সঙ্গে সঙ্গেই।

'এটা আমার বাবা,' বললে গ্লেব, 'আর এটা আমি...'

ফোটোগ্রাফের নিচে লেখা হল: 'বাম থেকে ডাইনে — লেখকের পুত্র, লেখকের পুত্রের পুত্র।'

গ্লেব তখন আরো তিনটি পারিবারিক ফোটো আনল, যাতে তার ছবি আছে কাকা, জ্যাঠা, পিসির সঙ্গে; ভাইবোনদের সঙ্গে এবং খুড়তুতো মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে। ফোটোগ্রাফে সঙ্গে সঙ্গেই সবাই চিনতে পারল ওকে।

'এই তো ও! নয়ত কী... এই দ্যাখ-না, উবু হয়ে বসে আছে! এক্কেবারে চেহারা বদলায় নি।'

মিরোনভা জেনে নিলে ছবির লোকগুলো গ্র. বরোদায়েভের ঠিক কী রকম আত্মীয়, এবং যথারীতি তলালিপি বানাল।

প্রায়ই অন্যান্য ক্লাস থেকে ছেলেরা আসত আমাদের কাছে।

'তোদের এখানে লেখকের সেই নাতিটা কে রে?' জিজ্ঞেস করত তারা।

গ্লেবকে দেখিয়ে দিতাম আমরা। প্রথম প্রথম সে ডেস্কের ওপর ঘাড় গুঁজে থাকত, সঙ্কোচে যেন সেঁধিয়ে যেতে চাইত তার ভেতর। কিন্তু পরে একটু একটু করে সিধে হল। আড়াল নেবার চেষ্টা না করে নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলত:

'ভারি আনন্দ হল। পরিচয় করা যাক!'

একবার উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের কী একটা সভায় গ্লেবকে নেওয়া হল সভাপতিমণ্ডলীর মধ্যে। ঘোষণাও করা হল কোন ক্লাস থেকে সে এসেছে। গর্বে আমাদের বুক ভরে গেল। তারপর থেকে কেউ যদি বলত যে গ্র. বরোদায়েভকে চেনে না, তার বই পড়ে নি, তাহলে চ্যাঁচাতাম আমরা: 'কী লজ্জার কথা! লেখাপড়া জানা প্রত্যেকটি লোকেই তো জানে যে...'

স্কুলের নানা সমাবেশে অন্যদের কাছে তুলে ধরা হত আমাদের দৃষ্টান্ত:

'শহরের নামকরা লোকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ক্লাসটা জানে। সাহিত্য ভালোবাসে এরা!'

'প্রতিটি লোকের মতো প্রতিটি ক্লাসেরও থাকা চাই নিজস্ব চেহারা, নিজস্ব চরিত্র,' বোঝালেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'আগে সেটা আমাদের ছিল না, এখন হয়েছে!'

'দেখেছিস, গ্লেব আজকাল কথা বলে তোর আমার চেয়ে খারাপ নয়,' একবার আমায় কেমন জানি জিজ্ঞেস করলে নাতাশা কুলাগিনা।

'...তোর আমার,' বললে সে। বুক আমার ঢিপঢিপ করে উঠল। ওর দিকে চাইলাম আমি স্নিগ্ধ দৃষ্টি না চেপেই।

'এখন ও সব কথাই শেষ পর্যন্ত বলে। দেখেছিস?'

নাতাশা আমায় যখন কিছু বলত, তখনই বুদ্ধিমানের মতো কোনো একটা মন্তব্য করার ইচ্ছে হত আমার। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বুদ্ধিমানের মতো কিছুই মাথায় খেলত না। তাই জবাবে বলতাম, 'সত্যি, ঠিক বলেছিস! আমি নিজেও তাই ভাবছিলাম!..'

'সত্যি, ঠিক বলেছিস তুই!' বললাম এবারেও, 'ঠিক তোর আমার মতোই চমৎকার করে কথা বলতে শুরু করেছে গ্লেব। আমিও লক্ষ করেছি।'

'দেখা যাচ্ছে, যশ ছড়ালে লোকের লজ্জা আড়ষ্টতার রোগ সেরে যায়,' বললে নাতাশা।

আমার মনে হল, এই কথাটা সে নিশ্চয় তার খাতায় টুকে রাখবে। গ্লেবের রোগ সেরে গেছে বলে ও খুশি। কেননা রোগ তো খারাপ জিনিস, আর রোগ সারা সর্বদাই ভালো।

'আগের মতোই সে এখনো কুকুর খাইয়ে বেড়ায়?'

'খেয়াল করে দেখি নি, তবে জেনে নেব। মাইরি বলছি, এটা তোকে জানিয়ে দেব!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি উত্তেজনা না চেপে, কেননা নাতাশার জন্যে কিছু একটা করা, তার কোনো একটা ফরমাশ বা অনুরোধ পালন করার স্বপ্ন দেখছিলাম বহুদিন থেকে।

'জেনে দরকার নেই,' বললে নাতাশা, 'হয়ত সময় পাচ্ছে না?'

'আরে, সে তো বটেই! স্কুলের সাধারণ সভায় যে ওর ডাক পড়ছে!..' সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উৎসাহ দেখিয়েছি বলে আফসোস হল। গ্লেবকে নিয়ে ওর অত আগ্রহ কেন? মেয়েরা বিখ্যাতদের ভালোবাসে। কথাটা যেন কোথায় পড়েছিলাম। কে জানে, নাতাশাও হয়ত তাই?.. কথাটা ভাবতেই চুপসে গেলাম। কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। 'না, নাতাশা অমন নয়!' বললাম মনে মনে, 'স্রেফ আমাদের ক্লাসটার দরদী। আর ক্লাসের নাম ছড়িয়েছে গ্লেবের জন্যে, তাই ওর অমন আগ্রহ।' হৃদয়ের মধ্যে যে ঈর্ষাগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হতে যাচ্ছিল, তা বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হল।

একদিন সাহিত্যের ক্লাসে ঘণ্টা পড়তে যখন মিনিট পনেরো বাকি, স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন:

'আজ আমার অনুরোধে গ্লেব আমাদের সকলের জন্যে একটা ছোট্ট চমকের ব্যবস্থা করেছে: সে তার দাদুর কয়েকটা চিঠি পড়ে শোনাবে। চিঠিগুলো লেখকের আত্মপরিজনদের কাছে লেখা। পারিবারিক সঞ্চয়ের এই জিনিসগুলো খুবই দামী: লেখকের আগ্রহের দিগন্ত এতে আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে, তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণের দুনিয়ায় উঁকি দেব আমরা।'

আগে গ্লেবকে কখনো ব্ল্যাক বোর্ডের কাছে যেতে বললে সে সঙ্কোচে মরত, এবার কিন্তু

গ্লেব ডেস্কগ্লোর মাঝখান দিয়ে নিশ্চিন্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বসলে মাস্টারদের চেয়ারটায়: স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ তাঁর নিজের জায়গাটা ওকে ছেড়ে দিলেন।

প্রতিটি চিঠি সম্পর্কেই স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বলতে লাগলেন যে ওটা 'ভারি তাৎপর্যপূর্ণ'। আর চিঠি যদি বেশ লম্বা হত, তাহলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন:

'কী রকম তাৎপর্যপূর্ণ! হাজার ব্যস্ত থাকলেও লেখক দৈনন্দিন জীবনের ছোটো সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামাবার সময় করেছেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি উনি জীবন থেকে কখনো নিজেকে সরিয়ে নেন নি, এই জীবন থেকেই তাঁর রচনা পুষ্ট হয়েছে।'

আর চিঠি যদি হত ছোটো, চিরকুটের মতো, তাহলেও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন:

'কী তাৎপর্যপূর্ণ, দ্যাখ্! কত সংক্ষেপ, একটি অনাবশ্যক কথাও নেই... এ থেকে আমরা বুঝতে পারি লেখক যত ব্যস্তই থাকুন, প্রতিটি মিনিটকেই তিনি কী মূল্যবানই না জ্ঞান করতেন!'

আরেকবার সাহিত্যের ক্লাসের শেষে স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ বললেন:

'আয় আজ গ্লেব বরোদায়েভকে অনুরোধ করা যাক, দাদুর জীবনের কোনো একটা ঘটনা সে আমাদের বলুক।'

ফের গ্লেব তার নতুন, নিশ্চিত পদক্ষেপে ডেস্কের সারির মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসল মাস্টার মশায়ের চেয়ারে। কিন্তু কোনো ঘটনাই তার মনে আসছিল না। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ হয়ত আমায় পড়া জিজ্ঞেস করবেন। এই সুযোগে তাই আমি প্রাণপণে চেঁচালাম:

'ভেবে দ্যাখ, গ্লেব! কিছু একটা মনে করে বল... এ যে ভারি ইণ্টারেস্টিং, ভারি জরুরী!'

'মনে করে দ্যাখ!' সোরগোল করে উঠল তেমন সবাই, যাদের ভয় ছিল পড়া বলতে হবে।

'দেখছিস তো, তোর দাদুর জীবন নিয়ে, তার মানে সাহিত্য নিয়ে সকলের কী আগ্রহ,' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

গ্লেব কোনো রকমে এইটুকু মনে করে বললে যে একদিন সে তার দাদুর সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল।

ঘণ্টা পড়তে তখনো দশ মিনিট।

'কী তোরা কিনলি সেখানে?' চেঁচালাম আমি, 'এটা যে ভারি তাৎপর্যপূর্ণ!'

গ্লেব তার স্মৃতিকথা চালিয়ে গেল।

পরের বার থেকে সাহিত্যের ক্লাসে আমরা নিজেরাই অনুরোধ করতে লাগলাম:

'গ্লেব আজ আরো কিছু একটা মনে করে বলুক। কোনো একটা ঘটনার কথা শোনাক!..'

'একেই বলে সাহিত্যিক ধরনে জীবন্ত আদান প্রদান!' বললেন স্ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ।

একের পর এক ঘটনা শোনাতে লাগল গ্লেব। বক্ষপিঞ্জরে ওর স্পন্দিত হয়েই চলল একটা সৎ, মহৎ হৃদয়, বন্ধুদের সাহায্য করতে যা সদাই প্রস্তুত।

আমাদের চোখে গ্র. বরোদায়েভের সাহিত্য কীর্তির মূল্য বেড়ে উঠতে লাগল ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

যাতে ভয়ংকর ঘটনার দিকে আরো কয়েকটি পদক্ষেপ ঘটবে

প্রথম দুই পরিচ্ছেদে যা বলেছি, সে হল আমার অতীত স্মৃতিকথা: এ সবই ছিল গত বছরের ব্যাপার।

আর এ বছরে স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ আমাদের ছেড়ে গেলেন।

আগে আমরা যখন এমন কিছু করতাম যা স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচের পছন্দ নয়, তখন তিনি সাবধান করে দিতেন:

'তোরা যদি একদম না বদলাস, তাহলে আমি পেনশন নিয়ে চলে যাব!'

বিদায় নেবার সময় কিন্তু তিনি আবেগ চাপতে পারলেন না। চোখের জলে তাঁর শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল।

মিরোনভা তার হাত তুলে বললে:

'আপনার শরীর খারাপ করছে?'

'না, না, খুব ভালো লাগছে!' বললেন স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচ, 'ভালো লাগছে, কারণ তোদের জন্যে আমার যা টান, সেটা এখন বুঝতে পারছি। তোদের আমি চিনি মাত্র একবছর, কিন্তু কক্ষনো ভুলব না... কক্ষনো না! লোকে বলে প্রথম ভালোবাসাটা সবচেয়ে জোরালো, আমার মনে হয় শেষের ভালোবাসা!..'

আমরা ওঁর শেষ ভালোবাসা! গর্ববোধে আমাদের হৃদয়কন্দর পূর্ণ হয়ে উঠল।

স্‌ভিয়াতোস্লাভ নিকোলায়েভিচের জায়গায় এলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা।

সুন্দরীটির বয়স বছর পঁচিশেক, তন্বী। নাকি শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে ওভাবে চলিত বর্ণনা ঠিক নয়? তবে মোটেই উনি শিক্ষয়িত্রীর মতো ছিলেন না। ঘণ্টা পড়ার পর যখন করিডর দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন ওঁকে অনায়াসে দশম শ্রেণী, এমন কি নবম শ্রেণীর ছাত্রী বলে মনে হতে পারত। ওঁর মুখের ভাবটা এমন যে, মনে হত এক্ষুণি বুঝি খিল খিল করে হেসে উঠবেন। এমন অদ্ভুত মুখের ভাব আমি শিক্ষকদের বেলায় কখনো দেখি নি। ওঁর পেছনে কেউ ওঁর পুরো নাম পিতৃনামের উল্লেখ করত না, স্রেফ বলত: নিনেল।

নিনেল ফিয়োদরোভনা আমাদের ক্লাসে প্রথম আসতেই ব্ল্যাক বোর্ড আর জানলার তাকের মাঝখানে স্ট্যান্ডটার দিকে তাঁর চোখ পড়ল। প্রকান্ড ফোটোগ্রাফটা দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'কিন্তু কে এই গ্র. বরোদায়েভ?'

আমরা সবাই থ' মেরে জমে গেলাম ডেস্কের সঙ্গে। হতভম্ব হল না শুধু মিরোনভা। মাস্টারদের সূত্র জুগিয়ে দিতে সে ভালোবাসত। এবারেও সে হাত তুললে, এবং উঠে দাঁড়িয়ে বোঝালে:

'বরোদায়েভ আমাদের এলাকার নামকরা লোক। উনি লিখে গেছেন এই শতকের তিরিশের দশকে।'

'কী লিখে গেছেন?' জিজ্ঞেস করলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা।

'নানা ধরনের রচনা,' বললে মিরোনভা, 'তাঁর নামে আমাদের এখানে সাহিত্য চক্রও আছে।'

'বরোদায়েভের নামে?' হেসে উঠলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা। উনি এসেছেন অন্য শহর থেকে, আমাদের শহরের নামকরা লোকটির খ্যাতি এখনো পর্যন্ত সেখানে পোঁছয় নি।

মিরোনভা ফের হাত তুললে এবং বোঝালে:

'লেখক বরোদায়েভের নাতি পড়ে আমাদের ক্লাসে। বসে আছে সব শেষের ডেস্কে মাঝের সারিতে। ও আমাদের চক্রের সম্মানী সদস্য।'

'সম্মানী? অমন গালভরা খেতাবটা কেন?'

নিনেল ফিয়োদরোভনা রেজিস্টার বই দেখলেন।

'গ্লেব আমায় মাপ করুক। আমি তার দাদুর কোনো বই পড়ি নি। প্রদর্শনীটা যখন বন্ধ হবে,' স্ট্যান্ডটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'তখন আমি বইগুলো নিয়ে পড়ে ফেলব। তাই গ্লেব, আমায় তুই মাপ করিস।'

আরো হিম হয়ে এল আমাদের শরীর। কেননা কোনো শিক্ষয়িত্রী কখনো আমাদের কাছে মাপ চান নি। তাছাড়া 'বরোদায়েভ কোণ'টা বন্ধ করার কথাই যে বললেন তিনি...

মন খারাপ হয়ে গেল: উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা তাহলে কি আর ছুটে আসবে না আমাদের দেখতে? কেউ কি আর বলবে না: 'এই ক্লাসটা শ্রদ্ধা দেখাতে জানে... এই ক্লাসটা সাহিত্য ভালোবাসে!' সবচেয়ে মামুলী একটা ক্লাস হয়ে দাঁড়াব আমরা?.. সত্যিই তাই হবে নাকি?

অন্যান্য ছেলেরাও মুষড়ে গিয়েছিল। সেটা আমি টের পাচ্ছিলাম: সবাই যেন একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল, খাতার পাতা ওলটানোর খসখস শব্দ পর্যন্ত শোনা গেল না।

মিরোনভা ফের হাত তুললে।

'আমরা আমাদের নামকরা নগরবাসীর রচনা নিয়ে একটা বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করছি...'

খুব তার ইচ্ছে হচ্ছিল যাতে নতুন শিক্ষয়িত্রী চটপট সবটা জেনে ফেলেন।

'এ শতকের কোন দশকে লিখেছেন বরোদায়েভ?' জিজ্ঞেস করলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা।

মিরোনভা হাত তুলে জানিয়ে দিলে:

'তৃতীয় দশকে।'

মাস্টারদের খেই ধরিয়ে দিতে সে ভালোবাসে।

'বরং গত শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে শুরু করা যাক,' প্রস্তাব দিলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা, 'ধরো পুশকিন থেকে... তারপর একের পর এক এগুনো যাবে। ক্রমে ক্রমে এসে পোঁছব বরোদায়েভে।'

'আমাদের চক্র হল সৃজনমূলক,' বললে মরকুটে, 'নিজেরাই আমরা লিখি।'

'আমিও কবিতা লিখি,' বললেন নিনেল ফিয়োদরোভনা, 'একদিন পড়ে শোনাব। যদি অবশ্য সাহস পাই। আমার সম্পর্কে তোরা আর কী জানতে চাস? এখনো বিয়ে করি নি। টেনিস খেলি। মাস্টাররা কখনোই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলেন না। অথচ জানতে তো সবারই ইচ্ছে হয়। ওটা আমি বুঝি। মনে আছে...'

আমার ওঁকে ভালো লাগতে শুরু করল। অভিজ্ঞ চোখ প্রায় নির্ভুলভাবেই বলে দিতে পারে যে অন্য ছেলেরাও চাঙ্গা হয়ে উঠল। নড়াচড়া শুরু হল তাদের।

'এ শহরে আমার আত্মীয়স্বজন বা চেনা-পরিচিত কেউ নেই। তোরাই হবি... যদি সম্ভব হয়...'

আগে ঘণ্টা পড়তেই আমরা সবাই লাফিয়ে উঠতাম। এবার কিন্তু উঠতে লাগলাম ধীরে সুস্থে। যেন ভাবনা চিন্তায় ওজন বেড়ে গেছে আমাদের।

নিনেল ফিয়োদরোভনার কাছে গিয়ে আমি বললাম:

'জানেন, বরোদায়েভের একটা নভেল আছে — 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য'... রোমহর্ষক ডিটেকটিভ বই! আমাদের গোটা চক্র ওই বাগান বাড়িটায় যেতে চায়। একেবারে অকুস্থলে... বেশি দূর নয়, ট্রেনে মাত্র একঘণ্টা...'

'ডিটেকটিভ বই লিখেছেন উনি?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন নিনেল ফিয়োদরোভনা। ইঙ্গিত করলেন বরোদায়েভের ফোটোগ্রাফের দিকে।

'ডিটেকটিভ বই আপনি ভালোবাসেন?' উত্তেজনা না চেপেই চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'ভালোবাসে সবাই। কেউ কেউ শুধু স্বীকার করে না। লজ্জা পায়...'

'আমাদের দুজনের মেজাজে একেবারে ষোলো আনা মিল!' মনে মনে ভাবলাম আমি, 'আমার মনের কথাটা ধরে ফেলেছেন!..'

আস্তে আস্তে ছেলেরা বেরিয়ে এল করিডরে। শুধু গ্লেব তার ডেস্কের ওপর কুঁজো হয়ে বসেই রইল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল দিনেমার প্রিন্স।

নিনেল ফিয়োদরোভনা এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। আমিও।

'আমরা ঠিক করছি পুরনো বাগান বাড়িটায় যাব,' বললেন তিনি, 'সামনের কোনো একটা রবিবারে। শরৎ থাকতে থাকতে... তুই আমাদের গাইড হবি, গ্লেব?'

'আমি, সে তো... অবিশ্যি আপনারা যদি... আমি আনন্দের সঙ্গে...' কথা সম্পূর্ণ করার অভ্যেস তার ফের গেছে।

নিনেল ফিয়োদরোভনা চলে গেলে দিনেমার প্রিন্স গ্লেবকে বললে:

'এই দিনটা নিয়ে আমি একটা কবিতা লিখব। হয়ত তোর ভালো লাগবে?..'

গ্লেবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির ফলে আমি অনেক আগেই জেনেছিলাম যে দিনেমার প্রিন্সের মধ্যে দৈহিক শক্তির সঙ্গে মিলে আছে শিশুর মতো লজ্জা আর দয়া।

করিডরে নাতাশা কুলাগিনা আমায় থামাল। এটা এমনই বিরল ঘটনা যে আমার বুক দুরদুর করে উঠল।

'আমি যদি তুই হতাম, তাহলে ওঁর প্রেমে পড়তাম,' বললে নাতাশা। বলে এমন স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে যে হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল: 'ঈর্ষা! জ্বালা!..'

ওহ, কী ঘনঘনই না আমরা আমাদের বাসনাটাকে বাস্তব বলে ভাবি!

'প্রেমে পড়ব?' সজোরে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'কী বলছিস? প্রেমে পড়ব কোন দুঃখে?..'

'তার মানে তোর চোখ নেই। অপরূপ লোক উনি!'

'সত্যিই কি নাতাশা চায় যে ওঁকে ভালোবাসি? সত্যিই কি তাতে নাতাশার কিছু এসে যায় না?' এমনি একটা মনমরা ভাবনা নিয়ে আমি সারা ইণ্টারভ্যালটা করিডরে ঘুরে বেড়ালাম।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে নিনেল ফিয়োদরোভনা বললেন:

'আমি টেনিস প্রতিযোগিতায় তৈরি হচ্ছি। শহর চ্যাম্পিয়নশিপ... কারো ইচ্ছে হলে আমার প্র্যাকটিস দেখতে আসতে পারিস। আমি ওখানে স্টেডিয়মে থাকব। জায়গাটা অবিশ্যি শহরের প্রান্তে, কিন্তু যেতে অসুবিধা হবে না: প্রথমে ট্রলিবাস, তারপর ট্র্যাম...'

গিয়ে জুটলাম প্রায় সবাই। শাদা রঙের খাটো শর্টস আর আঁটো শার্ট পরে উনি ছুটোছুটি করছিলেন টেনিস কোর্টে।

ওই পোশাকে নিজের ছাত্রছাত্রীদের সামনে ছুটোছুটি করার সাহস অনেকেরই হবে না। কিন্তু ওঁর সাহস আছে। তার কারণ উনি তরুণী এবং অপরূপ!

এবং সবাই আমরা উত্তেজনায় চেঁচাতে লাগলাম:

'নিনেল ফিয়োদরোভনা! নিনেল ফিয়োদরোভনা!..'

টুপি মাথায় বয়স্ক একজন লোক বসেছিল আমার সামনে। সে বললে:

'ভক্তরা তাদের পেয়ারের খেলুড়ের পুরো নাম পিতৃনাম সমেত চ্যাঁচাচ্ছে, এমন তো কখনো দেখি নি।'

দিন কয়েক পরে জনক-জননী কমিটির সভা ডাকা হল। মা-বাবা সে সন্ধ্যায় ব্যস্ত ছিলেন। সভায় গেল দাদা কস্তিয়া। মা-বাবা ব্যস্ত থাকলে আগেও সে এরকম গেছে।

কস্তিয়া না ফেরা পর্যন্ত আমি শুতে গেলাম না। সব সময় সে আমায় খুঁটিয়ে বলত বাপ মায়ে কে কী বলেছে, শিক্ষকেরা কে কী বলেছেন। শুনতে ভারি ইচ্ছে হয় বৈকি!

কস্তিয়া যখন ফিরল, তার আগেই মা-বাবা এসে গিয়েছেন।

'কী হল?' অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলাম দাদাকে।

'তোদের নিনেলের হয়ে ওকালতি করলাম!'

'ওঁর সমালোচনা হয়েছিল বুঝি?'

'সমালোচনা বলে সমালোচনা!'

'কার এমন সাহস?'

'তোদেরই মা-বাপেরা... সবাই অবশ্য নয়, তবে কেউ কেউ।'

'কী বললে তারা?'

'প্রথমত, উনি নাকি তোদের ক্লাসের চেহারা, তার মৌলিকত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত...'

'দ্বিতীয়ত, ওর ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে অনেক আগেই!' বললেন বাবা। ওঁর ধারণা, আমার উপস্থিতিতে বড়োদের, বিশেষ করে মাস্টারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়।

কস্তিয়া নিরুপায়ের ভঙ্গিতে হাত ওলটালে।

'যাই হোক, আমি ওঁর পক্ষে ওকালতি করেছি।'

'মাস্টারনীকে তোর ভালো লেগেছে, তাই না?' এমন সুরে বাবা বললেন যেন উত্তরটাও জুগিয়ে দিতে চাইছেন, 'ভালো লেগেছে তো?'

'হ্যাঁ, ভারি চমৎকার লোক!' বললে কস্তিয়া।

তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি অনেক আগেই জেনেছি যে সংকট সময়ে লোকে তার রুগ্ন অঙ্গটা চেপে ধরে, কেউ মাথা, কেউ বুক। বাবা চেপে ধরলেন তাঁর পাঁজর।

'হল-টা কী?' জিজ্ঞেস করলে কস্তিয়া। তারপর শুতে গেল।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

যাতে পুরনো বাগান বাড়িতে যাত্রা শুরু হবে

পরের দিন আমার অভিজ্ঞ চোখে প্রায় নির্ভুল টের পেলাম যে, ক্লাসে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না যে সভায় নিনেলের সমালোচনা হয়েছিল।

'জনক-জননী সভায় মা-বাপেরা না গিয়ে বরং দাদাদের যাওয়াই ভালো,' ভাবলাম আমি, 'বাবা কস্তিয়াকে না থামিয়ে দিলে সবটাই শোনা যেত!'

সকালে দাদাকে ধরলাম স্নানঘরে।

'বলো না, ওঁর নামে কী ওরা বলেছিল?'

'না, বাবা ঠিকই বলেছেন। তুই ক্লাসে সব বলে বসবি। অথচ মেয়েটা অমন খাসা! মানে, ভালো আর কি...'

'কেউ কিচ্ছু জানবে না! কেউ না!..'

'তোকে আমি চিনি!'

কস্তিয়া কেটে পালাল।

ক্লাসের আগে নাতাশা কুলাগিনা এল আমার কাছে। 'এ সপ্তাহে ও এর মধ্যেই আমার কাছে এল দু'বার!' প্রায় আনন্দ না চেপেই ভাবলাম আমি, 'তার মানে, নেহাত দৈবাৎ নয়!..'

ওহ্, কতবারই না আমরা বাসনাকে ভাবি বাস্তব!

'মা কাল সভায় যান নি। কী আলোচনা হল জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

নাতাশার ইচ্ছে তো আমার কাছে শিরোধার্য! বললাম:

'নিনেলের সমালোচনা করেছে।'

'কে করলে?'

'মা-বাপেরা। সবাই অবিশ্যি নয়। তবে কেউ কেউ...'

ঠোঁট ওর কেঁপে উঠল। সরোষে সে চেঁচিয়ে বললে:

'আর চুপ করে রইল সবাই?'

'আমার দাদা চুপ করে থাকে নি! নিনেলের পক্ষ নেয় সে। নিনেলকে তার ভালো লেগেছে।'

'তার মানে ওর চোখ আছে, তোর নেই।'

ওহ্, এই সময় যদি সে আয়নায় নিজের মুখটা দেখত, তাহলে বুঝত আমার চোখ আছে কি নেই।

'মার অসুখ...' বললে নাতাশা, 'নইলে মা হয়ত ওদের বোঝাতে পারত।'

'কী অসুখ তোর মায়ের?!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'হয়ত সাহায্য টাহায্যের দরকার? হুকুম কর তুই, শুধু মুখের একটু কথা খসা, সব করে দেব।'

ভয় পেয়ে নাতাশা তাকাল আমার দিকে। এমন কি পিছিয়েই গেল।

'তোর নিজের শরীর ঠিক আছে তো?'

'ঠাট্টা নয়!' বললাম আমি প্রায় ক্ষোভ আর অপমান বোধ না চেপেই, 'ওষুধ জোগাড় করার দরকার থাকতে পারে। আমার পিসি ডিসপেন্সারিতে কাজ করে। সব সময় ওষুধ জোগাড় করে দেয়...'

'মার দরকার শুধু একটি ওষুধ: উত্তেজনা চলবে না। থাকতে হবে পুরোপুরি শান্তিতে! এ ওষুধ তোর পিসি জোগাড় করতে পারবে না। আমাদের কালে ও ওষুধ স্রেফ বানায় না।'

ভাবলাম, এ কথাটা সে নির্ঘাৎ তার খাতায় টুকে রাখবে!

'আমাদের নিনেল আজ ক্লাসে আসবেন কী চেহারায়?' ভাবলাম আমি, 'নিশ্চয় আজ কারো মনে হবে না এই বুঝি উনি খিলখিলিয়ে হেসে উঠবেন। হয়ত বিচলিত থাকবেন খুব। কী করব তখন? সান্ত্বনা দেব? না, তা চলে না। নাকি উনি একেবারে চুপ মেরে যাবেন, যা কখনো হয় নি!..'

নিনেল ফিয়োদরোভনা এলেন ঠিক আগের মতোই চেহারায়।

'তোদের সঙ্গে আমার একটা আলোচনা আছে। পরে এক সময় করা যাবে...' বললেন তিনি, 'হয়ত আমারই কোনো ভুল হয়েছে। যাই হোক, পুরনো বাগান বাড়িটার কথা কিন্তু ভাবার সময় হয়েছে। তোদের কথা দিয়েছিলাম। হাওয়া খাওয়া যাবে, বেড়ানো যাবে শরতের বনে। গ্লেব হবে আমাদের গাইড।'

'পুরনো বাগান বাড়িটায় যাবো আমরা! নভেলে যে ঘরগুলোর বর্ণনা আছে, তাতে ঘুরে দেখব... যে টেবিলের সামনে বসে গ্ল. বরোদায়েভ কাজ করতেন, সেটাও। কী চমৎকার হবে। তাছাড়া বলতে গেলে বরোদায়েভ আর আমি তো, একই পেশার লোক!' এই সব ভেবেই আহ্লাদ

হচ্ছিল আমার, ঘূণাক্ষরেও সন্দেহ করি নি যে ভয়ঙ্কর ঘটনাটা একেবারে কাছিয়ে এসেছে, প্রায় পাশেই...

'বরোদায়েভ কোণ' আমাদের ক্লাসে তখন আর ছিল না। দিনেমার প্রিন্স যে স্ট্যান্ডটা ঠেলে এনেছিল, তাতে শুরু হয়েছে পুশকিন প্রদর্শনী; ঠিক সেই সময়েই ক্লাসে পুশকিন চলছিল, মানে পড়ানো হচ্ছিল আর কি... নিনেল বলেন, 'চলা' আর পড়া এক জিনিস নয়।

গ্লেব আমায় বাড়ি থেকে গ্র. বরোদায়েভের নভেলটা এনে দিলে। আরেক বার সেটা পড়ে নেওয়া গেল। আধখানা পাতা স্রেফ মুখস্থই করে ফেললাম:

'কেউ তার নাম জানত না, উপাধি ও পিতৃনাম তো দূরের কথা। সবাই তাকে বলত বাগান বাড়ির বাসিন্দে। সেই শীতকালটায় যে ভাবে সে ছিল, তাতে এ নামটা খুবই মানিয়ে গিয়েছিল; পুরনো বাগান বাড়িটার দোতালায় কোণের ঘরটি ভাড়া নিয়ে ছিল সে, তার একটি মাত্র জানলা, সেটা বাগানের দিকে। ঘরটা থেকে বাসিন্দে প্রায় বেরুত না।

'আর প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়ে চলেছে। প্রথমটা সে স্পষ্টতই বাসিন্দের সঙ্গে খুনসুটি করত: চোখ ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে খেলা করত, ঘরখানায় পাঠাত তুহিন হাওয়া, শার্শিতে দিত ন্যাড়া ডালপালার টোকা... লোকটা কিন্তু ওদিকে কোনো মন দিত না তাই রেগে উঠল প্রকৃতি: হাওয়ার ঝাপটা দিলে, শিস দিলে, দুয়ো দিলে। রেগে গেল প্রতিবেশীরাও: একঘেয়ে শীতের দিনে একটু আলাপ জমিয়ে তাদের আনন্দ দেবার চেষ্টা করত না সে। কেউ কখনো দেখে নি কী খাদ্য, কী পানীয় সে খায়। ঘুমোবার আগে সে হেঁটে বেড়াত মিনিট পনের, তার বেশি নয়। জীবনে শেষ বারের মতো সে পায়চারি করেছিল নতুন বছরের পূর্বসন্ধ্যায়। লোকে শুনেছিল কী ভাবে মাঝ রাতে সে তার ঘরে উঠেছিল ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়ি বেয়ে। সকালে কিন্তু ওকে আর পাওয়া গেল না... সিঁড়িতে যাবার দরজাটা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ। বাগানের দিককার জানলাটাও আটকানো! বরফের ওপর কোনো পায়ের চিহ্ন নেই। উধাও হয়ে গেল বাগান বাড়ির বাসিন্দে।'

এই ভাবেই নভেলের শুরু। তারপর আগেই যা বলেছি, তিনশ' সাড়ে তেইশ পাতা ধরে তাকে খুঁজে বেড়ায় গোয়েন্দা, কুকুর ও আত্মীয়স্বজনেরা। দেখা গেল, আত্মীয়স্বজন তার ছিল অনেক, তাদের কাছ থেকেই সে পালিয়ে এসে ছিল বাগান বাড়িতে: কী একটা আবিষ্কারে নাকি বাধা দিচ্ছিল তারা। উপন্যাসে বলা হয়... 'শান্তি চেয়েছিল সে, কিন্তু যা পেল তেমন শান্তি নয়। যদিও... আজও পর্যন্ত কিছুই জানা যায় নি... সন্ধান চলছে...'

'দাদু চেয়েছিলেন আরো লিখতে... পূর্বানুবৃত্তি আর কি... কিন্তু উনি... মানে বুঝলি তো?' গ্লেব আমায় বলেছিল।

আর হঠাৎ আমরা এবার যাব সেই প্রহেলিকার জায়গাটাতেই! তাছাড়া, উপন্যাসে যেসব কথা বলা হয়েছে, তা কিন্তু বানানো নয়, সত্যিসত্যিই ঘটেছিল। সে কথা আমায় সেই রবিবারের সকালেই বলেছিল লেখকের নাতি। ব্যাপারটা সে এতদিন চেপে রেখেছিল: ভেবেছিল সোজাসুজি ঘটনাস্থলে যেতে আমরা ভয় পাব।

'তুই যে ভয় পাবি না, সে তো আমি...' বললে গ্লেব, 'তুই ডিটেকটিভ, কিন্তু অন্যেরা?..'

'অন্যদের একটি কথাও নয়!' বললাম আমি।

তারপর গ্লেব আরেকটি খবর দিলে, সেটা আমায় খানিকক্ষণের জন্যে বিচলিত করে তুলল: নিনেল ফিয়োদরোভনা অসুস্থ।

'বোঝাই যাচ্ছে, স্নায়বিক আঘাত!' বললাম আমি, 'করে ছাড়লে বটে!'

'না-না,' গ্লেব বোঝাতে লাগল, 'নতুন বাড়িতে তার কুঠরি... উঠে এসেছিল... বাস, ঠাণ্ডা লেগে...'

কথা বলছিলাম আমরা স্কুলের আপিস ঘরে, কথা ছিল সাহিত্য চক্রের সমস্ত সভ্য সেখানেই এসে জুটবে।

'বাকিদের নিয়ে আমি অন্য একবার শীতের সময় শহরের বাইরে যাব স্কি করতে। ঠিক আগেই জানিয়ে পাঠিয়েছিলেন নিনেল,' বাগান বাড়িতে সকলের গিয়ে ওঠা ভালো দেখায় না। যতই হোক মিউজিয়ম তো নয়। লোক থাকে...'

আমি এসেছিলাম নির্ধারিত সময়ের তিরিশ মিনিট আগেই: তর সইছিল না। আর গ্লেব তো আরো আগে।

'ডিউটির মেয়েটির কাছ থেকে জানলাম... কাল সন্ধেতেই... আমি এসেছিলাম...' বোঝালে গ্লেব, 'নিনেল ফিয়োদরোভনা ওঁকে... মানে, টেলিফোন করে...'

'তাহলে কাল আমাদের জানালি না কেন? অন্তত একা আমায় বলতে পারতিস?'

'ভয় হল হয়ত তোরা... যাবি না হয়ত... কী বলিস, আমরা নিজেরাই?.. নিনেল ফিয়োদরোভনা ছাড়াই? এ্যাঁ?.. কী বলিস তুই? নাকি যাব না?.. ওখানে গিয়ে সব তদন্ত করে দেখা যায়... রহস্য ফাঁস করা যায়, বুঝলি তো? তুই তো আমাদের ডিটেকটিভ!'

চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি, আর সে অবস্থাটা চলল বেশ অনেকক্ষণ। নাতাশা কুলাগিনা, দিনেমার প্রিন্স, মরকুটে আর মিরোনভা না আসা পর্যন্ত।

দিনেমার প্রিন্স চৌকাট থেকেই ঘোষণা করলে:

'সকালে আজ কয়েকটা লাইন মাথায় খেলে গেল, হয়ত তোদের ভালো লাগবে?'

খাতার পাতাটা সে এগিয়ে দিল মরকুটের দিকে। নিজের কবিতা সে নিজে কখনো পড়ে শোনাত না, লজ্জা পেত। মরকুটে উচ্চৈঃস্বরে, সত্যিকারের কবির মতো গলা কাঁপিয়ে শোনাল:

এই দিনটার প্রতীক্ষায় ছিনু আমরা সবে:
যাব, যাব বাগান বাড়ি, যাব আমরা কবে!
আকাশখানা যদিও আজ কালো মেঘে ঢাকা,
গ্লেব আমাদের গাইড, মোরা কেউ নইকো একা!
ঝড়বৃষ্টি এলোমেলো তুফান ভেদ করে
আমাদের সে নিয়ে যাবে লেখক দাদুর ঘরে!..

হৃদয়বান প্রিন্স জানত যে অনেক দিন থেকে কেউ আর গ্লেবকে তার ঠাকুর্দার জীবন কথা বলতে বা তার চিঠি পড়ে শোনাতে বলে না। বরোদায়েভদের সাংসারিক সঞ্চয়ের ফোটোগ্রাফগুলোয় কেউ আর দৃষ্টিপাত করে না অনেক দিন।

কবিতা শুনেই কেমন ভারিক্কি হয়ে উঠল গ্লেব, মুখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল। অভিজ্ঞ চোখ প্রায় নির্ভুলভাবেই বলে দিতে পারত যে গ্লেব তার সেই অতীত খ্যাতির দিনগুলোর কথা ভাবছে।

হৃদয়বান প্রিন্স তাকে আমাদের গাইড হতে ডেকেছে, গ্লেবের গলাও সঙ্গে সঙ্গেই সচরাচরের চেয়ে জোরাল ও নিশ্চিত হয়ে উঠল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, তোরা যাবি কি না,' বললে সে, 'নিনেল ফিয়োদরোভনা অসুস্থ।'

'কী হয়েছে তাঁর?' জিজ্ঞেস করলে নাতাশা কুলাগিনা।

'নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন... বাস... ঠাণ্ডা লেগে গেছে,' বললে গ্লেব।

'তাহলে গিয়ে একটু দেখাশোনা করা দরকার বোধ হয়?'

'কোথায় ও রাস্তাটা? বাড়িটা কোথায়?..' অলসভাবে বললে মরকুটে।

'ঠিকানা? ঠিকানাটা বোধ হয় কেউ...' বললে গ্লেব, এবং তারপর দৃঢ়ভাবে যোগ দিলে: '...জানে না!'

কথাটা শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করে গেল সে: প্রিন্স যে তাকে বলেছে আমাদের গাইড।

'নিজেরাই চল বাগান বাড়িতে যাই!' হঠাৎ সকলের দিকে চেয়ে দৃঢ় গলায় বলে উঠলাম আমি।

নাতাশা কুলাগিনা যতক্ষণ আসে নি, সে আধঘণ্টা আমি সংশয়ে দুলছিলাম, কিন্তু আসতেই হঠাৎ সংকল্প স্থির হয়ে গেল: 'না যাওয়া অসম্ভব! সারা দিনটা যে নাতাশার সঙ্গে কাটাতে পারব! এ যে আক্ষরিক অর্থেই নিয়তির নির্বন্ধ! কার স্পর্ধা আপত্তি করে? আর বলা যায় না, হঠাৎ ওর উপস্থিতিতেই যদি সত্যিই কিছু একটা তদন্ত করে বার করে ফেলি গোয়েন্দারা আর আত্মীয়স্বজনেরা যা ধরতে পারে নি, তেমন কিছু একটা যদি ফাঁস করতে পারি? তখন সে বুঝবে যে ডাকনামটা আমার জুতোর থলেটার জন্যে নয়, তার পেছনে গুরুত্ব আছে। এবং শেষ পর্যন্ত আমার কদর বুঝবে...'

'ঝড়বৃষ্টি ভালো লাগে মে মাসের গোড়ায়!' বললে মরকুটে, 'কিন্তু সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে...'

অলস ভঙ্গিতে সে ইঙ্গিত করলে জানলার দিকে।

'তাছাড়া নিনেল ফিয়োদরোভনাই বা এটা কী চোখে দেখবেন জানি না,' বললে মিরোনভা, 'উনি চেয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে নিজে বনে বেড়াবেন, হাওয়া খাবেন!'

'আমাদের জন্যে ওখানে... মানে, কাল সন্ধ্যায় আমি টেলিফোনে, ট্রাঙ্ক কলে...' বললে গ্লেব। তারপর জোর করে শেষ করলে, 'জানিয়ে রেখেছি যে আমরা আজ আসছি।'

'হ্যাঁ, যাওয়া কি না যাওয়া — এই হল প্রশ্ন!' এবার ঠিক হ্যামলেটের ঢঙেই বলে উঠল দিনেমার প্রিন্স।

এই সময় ঘণ্টি বেজে উঠল টেলিফোনের।

গ্লেব নিজেকে তখনো আমাদের গাইড বলে ভাবছে, তাই টেলিফোনটা সেই ধরলে।

'হ্যালো! কে বলছেন? নিনেল ফিয়োদরোভনা, আপনি?..' মুখের নরম, মখমলী চামড়া তার লাল হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, মানে আমরা সবাই... বুঝতে পারছি না যাব কি...' এবং তারপরে জোর করে কথা শেষ করলে, '...নাকি আপনাকে বাদ দিয়ে যাব না?'

হঠাৎ গ্লেবের চোখদুটো জ্বলে উঠল দুর্বোধ্য আনন্দে। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি বুঝলাম, নিনেল ফিয়োদরোভনা ওকে কিছু মনের মতো কথা বলেছেন।

'হুঁ, হুঁ, বুঝেছি... বেশ, আমরা যাচ্ছি, আপনি যখন সায় দিচ্ছেন... আলিককে দেব?'

রিসিভার টেনে নিলাম আমি। একটু যেন তা ভিজে ভিজে। বোঝা যায় খুবই নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল গ্লেব।

'বলুন নিনেল ফিয়োদরোভনা! ও, সর্দিজ্বর? ঠিক আছে, আমি গ্লেবকে সাহায্য করব। কথা দিচ্ছি! ধন্যবাদ যে আমার ওপর ভরসা রেখেছেন!'

ইচ্ছে হচ্ছিল, আমার জবাব শুনেই নাতাশা যেন বোঝে যে নিনেল ফিয়োদরোভনা ঠিক আমাকেই বলেছেন গ্লেবকে সাহায্য করতে, ঠিক আমার ওপরেই ভরসা রেখেছেন। ন্যায়তই গর্ববোধে হৃদয় আমার পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

'আপনার টেম্প্যারেচার কত?' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি: মেজাজ তখন আমার সপ্তমে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য হল, তাই সশঙ্কে যোগ দিলাম, 'বেশি নয়, আশা করি?'

'একশ তিন ডিগ্রি,' বলেই ফোন নামিয়ে রাখলেন।

'আমাদের ওপর যখন ভরসা করে আছেন, তখন তার মান রাখা উচিত,' গ্লেব বললে একেবারে সুস্পষ্ট উচ্চারণে।

'এ্যাঁ? তাই ভাবছিস তুই?' এ্যাঁ-উঁ করে বললে মরকুটে।

'এখন তাহলে রওনা দিতে হয়,' বললে মিরোনভা, 'উনি নিজে থেকে যখন ফোন করলেন!..'

'সবাই মন দিয়ে শোন!' হুকুম দিলে গ্লেব, 'ট্রেন ছাড়বে ন'টা পনেরয়। কারো হারিয়ে যাওয়া চলবে না, সবাই আমার পেছু পেছু। কেউ আটকে যাবে না! যেখানে আমি, তোরাও সেখানে!..'

'তুই একবার বলেছিলি না? যশে লোকের জড়তা সংকোচ সেরে যায়?' ফিস ফিস করে বললাম নাতাশাকে, 'একেবারে ঠিক কথা! গ্লেবের জড়তা ফের সেরে গেছে!..'

'দুঃখের কথা,' বললে নাতাশা।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম আমরা।

আর প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়ে চলেছে...

আবহাওয়াটা খাসাই! বৃষ্টি পড়ছে, মুখে ঝাপট মারছে বাতাস, মাটি কাদা কাদা হয়ে এঁটে

যাচ্ছে পায়ের সঙ্গে... ভাবলাম: 'বেশ একটা যুতসই মেজাজ গড়ে ওঠার সুযোগ হবে এতে। কেননা, আমরা তো আর আমোদ করতে যাচ্ছি না, যাচ্ছি একটা রহস্যজনক অপরাধের জায়গায়!'

'পুশকিন শরৎকাল ভালোবাসতেন,' বললে ভেজা-সপ্‌সপে মরকুটে, 'কিন্তু কীসের জন্যে?..'

৫ম পরিচ্ছেদ

যাতে আমরা ভয়ংকর ঘটনাটার একেবারে চৌকাটে গিয়ে দাঁড়াব

ট্রেনে যেতে যেতে অমন যুৎসই আবহাওয়াটা নষ্ট হয়ে গেল। উঁকি দিলে সূর্য। স্পষ্টতই, প্রকৃতি খুনসুটি করছিল আমাদের সঙ্গে। শারদীয় কিরণ নিয়ে খেলা করছিল সে, ওভারকোটের তলে ছুড়ছিল ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা, ন্যাড়া ন্যাড়া ডালপালা নাড়াচ্ছিল আমাদের দিকে... এমন আবহাওয়ায় কি আর অপরাধের ঘটনায় ঠিক মতো মন বসানো যায়?

তাহলেও মন বসালাম... এর আগের দিন রেডিওতে শুনেছিলাম যে সুরকার বরোদিন মারা যাবার পর তাঁর অপেরা 'রাজা ইগর' সম্পূর্ণ করেন নাকি তাঁর বন্ধুরা।

এটা আমার কাছে এক মহা আবিষ্কার! তাতে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। বলতে কি, একসঙ্গেই অনেকগুলো আইডিয়া... বলা যায় না, গ্র. বরোদায়েভের উপন্যাস হয়ত শেষ হবে আমার হাতেই? লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেল, সে রহস্য হয়ত আমিই ফাঁস করব? লিখব পুরনো বাগান বাড়ির দ্বিতীয় খন্ড। সাহিত্য চক্রে তা পড়ে শোনাব। নাতাশা কুলাগিনা তার খাতায় নিশ্চয় কোনো অসাধারণ মন্তব্য টুকে রাখবে। লিখবে, 'অবশ্যই মরকুটের সঙ্গে, এমন কি দিনেমার প্রিন্সের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না। কারো সঙ্গেই তুলনা করা চলে না!..' আমি জানতাম না, এমন কি অনুমান করাও সম্ভব ছিল না যে সেই দিনই, ঠিক সেই সাধারণ রবিবারটাতেই... কিন্তু না, আগেই লাফিয়ে যাব না, যদিও খুবই ইচ্ছে হচ্ছে...

রোদ দেখে চাঙ্গা হয়ে উঠল ফ্যাকাশে মরকুটে, বললে:

'পুশকিন একবার বলেছিলেন, 'জয় হোক রোদের!' তাঁর একথাটার সঙ্গে আমি একমত।'

বাগান বাড়ি অঞ্চলের ছোট্ট স্টেশনটার কাঠের প্ল্যাটফর্মে যখন আমরা নামলাম, চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল নাতাশা।

'কাকে তুই খুঁজছিস?' সশঙ্কে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'টাইম-টেবিলটা... আমায় ফিরতে হবে ছ'টা কি সাতটা নাগাদ। তার পরে নয়। নইলে মা দুশ্চিন্তা করবেন।'

'উনি এখনো শয্যাশায়ী?'

'হ্যাঁ,' বললে নাতাশা, 'বুকটা ওঁর...'

ছুটলাম টাইম-টেবিলের দিকে। মনে হল বুঝি কেউ যেন আমার আগেই ছুটে যেতে চাইছে।

সর্বদাই এই হয়, সর্বদাই: কাউকে যদি একটু ভালো লেগে যায়, তাহলে মনে হয় সবাই বুঝি ঠিক তোমার মতোই কেবল তার জন্যেই উৎসুক, তুমি যা করতে চাও, সবাই যেন ঠিক তোমার আগেই তা করে বসবে। ফলে মন আর শান্তি পায় না।

'ট্রেন আছে বিকেল পাঁচটায়!' রিপোর্ট দিলাম আমি, 'তার পরে আটটা দশে।'

'পাঁচটায় হলেই আমাদের পক্ষে ভালো! ঠিক সময়ে আমরা ফিরতে পারব তো?'

'আমাদের... আমরা...' এমন কথা আমি সারা জীবন ধরে শুনে যেতে রাজী।

'চল, যাই!' হুকুম দিলে গ্রেব।

স্টেশন থেকে আমরা হাঁটলাম মিনিট চল্লিশেক, তার বেশি নয়। তবে তার কমও নয়, কেননা আমি ঘড়ি দেখছিলাম। দাদার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম ঘড়িটা, যেন আগেই জানতাম যে ঘড়িটা এদিন... না, আগেই লাফিয়ে যাব না। মোটেই না!

'আমার পেছু পেছু!' হুকুম দিলে গ্রেব। অধিনায়ক হয়ে সে খুশি, 'কেউ আটকে যাবে না!'

ওকে এখন প্রায় চেনাই যায় না।

নিয়তির এমনই নির্বন্ধ যে বাগান বাড়িতে যাবার রাস্তাটা ছিল ভারি গোলমেলে। সেটা আমার ভালোই লাগল। চললাম আমরা যেন এক গোলক-ধাঁধা দিয়ে: কখনো বনে ঢুকছি, কখনো যাচ্ছি বাগান বাড়িগুলোর বেড়ার মধ্যে দিয়ে, কখনো পাক দিয়ে যাচ্ছি কোনো গোলাঘর, কখনো ফের আবার বনের মধ্যে... মনে হল কারো কাছ থেকে চম্পট দিয়ে আমরা আমাদের অনুসরণকারীদের হাত এড়াবার চেষ্টায় আছি।

ভাবলাম, ফিরতি পথে গ্রেব নইলে স্টেশনে পেঁছিনো অসম্ভব।

'আমার পেছু পেছু! পেছু পেছু!..' তাড়া দিলে গ্রেব। তারপর ফের বাঁক নিলে কোন দিকে।

শেষ পর্যন্ত থামল সে। সুতরাং আমরাও।

'এসে গেছি!' বললে গ্রেব।

তাকিয়ে দেখলাম বাগান বাড়িটাকে। তার এক দিকটা সোজা রাস্তার ওপর এসে পড়েছে, অন্য দিকটা সোজাসুজি বনে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভারি অবাক লাগল এই দেখে যে, পুরনো বাগান বাড়িটা মোটেই পুরনো নয়।

'নতুন রঙ করেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম গ্রেবকে।

'না, বরাবরই এমনি।'

''পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য' — কথাটা শোনায় কেমন?' মরকুটে আমায় জিজ্ঞেস করলে।

'ভালোই শোনায়।'

'আর 'নতুন বাগান বাড়ির রহস্য'?'

'তেমন নয়।'

'তাহলে বুঝলি তো? সাহিত্যিকের কল্পনা কী ভাবে খেলে তা জানিস?'

মরকুটের দিকে গদগদ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চাইলে দিনেমার প্রিন্স।

আর মরকুটের এই প্রশ্ন ক'রে ক'রে জবাব বোঝানো, যেন কারো পরীক্ষা নিচ্ছে, এটা আমি সইতে পারতাম না।

'ফলক দেখা যাচ্ছে না কেন?' আবার বললে সে।

'কীসের ফলক?' জিজ্ঞেস করলে গ্লেব।

'অবশ্যই স্মারক-ফলক! 'এইখানে থাকতেন ও মারা যান...''

'এখানে মারা যান নি...'

'তাহলে এইরকম: 'লেখক গ্ল. বরোদায়েভ এখানে থাকতেন, কিন্তু মারা যান নি'!'

ভাবলাম, 'মরকুটে, কি সত্যিই তার পরের কবিতা উৎসর্গ করতে চাইছে ন. ক.'র নামে? নইলে নাতাশার সামনে ও অত বিদ্যে ফলাতে চাইছে কেন?'

দিনেমার প্রিন্স সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে।

ঠিক করলাম তৎক্ষণাৎ উদ্যোগ নিতে হবে।

'আমি আর চুপ করে থাকতে পারছি না। একটা জরুরী কথা তোদের জানা দরকার,' বললাম আমি, 'গ্ল. বরোদায়েভের নভেলে যা লেখা আছে, সেটা সাহিত্যিকের কল্পনা নয়। এইখানে, ঠিক এই বাগান বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায় একটা লোক... স্রেফ হাওয়া! আমরা যাচ্ছি নভেলের পদচিহ্ন ধরে নয়, সত্যিকারের একটা অপরাধের পদচিহ্ন ধরে...'

চুপ করে গেল মরকুটে।

'বাগান বাড়িতে কেউ আছে?' জিজ্ঞেস করলাম গ্লেবকে।

'ভাড়াটেরা সবাই চলে গেছে।'

'সব্বাই?..' ফিস্ ফিস করলে মরকুটে।

'সে তো দেখাই যাচ্ছে!' চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি, 'বসতিটায় এখন একটি জনপ্রাণীও নেই। যতই চেঁচাস, কারো কানে যাবে না।'

'কিন্তু চেঁচাব কেন আমরা?' জিজ্ঞেস করলে নাতাশা।

'আরে, ভয় নেই কিছু!' বললাম আমি, 'অবিশ্যি সব কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু আমি... মানে আমরা তো পাশেই আছি। তাহলেও একটা লোক তো উধাও হয়ে গেছে...'

মনে হচ্ছিল, 'ঈস, নাতাশাকে রক্ষা করার কোনো একটা সুযোগ যদি আমার কোনো রকমে জোটে!'

হাত তুললে মিরোনভা।

'নিনেল ফিয়োদরোভনা কিন্তু বলেছিলেন: 'হাওয়া খাব, শরতের বনে বেড়াব!''

তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি টের পেলাম যে মিরোনভা ভয় পায় নি, নিতান্ত গুরু নির্দেশের বাধ্য হতে চাইছে সে। ওই ওর এক প্রচন্ড বৈশিষ্ট্য।

'গ্ল. বরোদায়েভ যেখানে নিঃশ্বাস নিতেন, প্রথমে সেই হাওয়াটা খাওয়া যাক!' জবাব দিলাম আমি।

'কিন্তু ভেতরে, মানে বাগান বাড়িটায় ঢুকব কী করে?' শান্তভাবে শুধাল দিনেমার প্রিন্স।

'দরজা খোলা আছে,' বললে গ্রেব, 'আমি যে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা আসব। কাল ট্রাঙ্ক কলে...'

'চল ঢোকা যাক!' চেঁচিয়ে বললাম আমি, 'ভয় নেই!'

এবং নিজেই প্রথম ঢুকলাম ভেতরে।

ভেতরটা সবই চুপচাপ। শুধু ওপর দিক থেকে আসছে কেমন একটা বিড়বিড়ানি শব্দ। সবাই আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমিও শিউরে উঠলাম... কিন্তু অভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও স্থির করা গেল না জিনিসটা কী: শিউরে উঠলাম অবশ্য ভেতরে ভেতরে, মনে মনে।

গ্রেব বললে, 'ও হল বাড়িওয়ালীর ভাইপো গ্রিগোরি,' বললে, তবে কেমন যেন তেমন চট করে নয়, 'এলাকাটার সমস্ত বাগান বাড়িই ও পাহারা দেয়। আমাদের অপেক্ষায় আছে... সবকিছু আমাদের বলবে।'

'সেই সিঁড়িটা!' মনে মনে ভাবলাম আমি, 'বইয়ে যা লেখা আছে, 'ক্যাঁচকেঁচে'! নববর্ষের রাতে তার শেষ পায়চারির পর লোকটা উঠে গিয়েছিল এই সিঁড়ি দিয়ে। পরে আর কখনো পায়চারি করে নি!..'

'ক্যাঁচকেঁচে' সিড়িটা দিয়ে উঠলাম আমরা। সিঁড়িটা কিন্তু ক্যাঁচ ক্যাঁচ করলে না। 'বোঝাই যাচ্ছে, সাহিত্যিকের কল্পনা!' ভাবলাম মনে মনে।

ওপরের ঘর থেকে এখন সুস্পষ্ট কথা ভেসে আসছিল:

'বটে, তোমরা এই কায়দায়?.. আমরা তোমাদের গর্দানে — গদাম্! ওহ, এখনো টাঁইফুঁই? আমরা তোমাদের গলায় — ফটাশ!..'

থেমে গেল মরকুটে। তার পেছনে পেছনে বাকি সবাই।

'এখনো নড়ছো? তাহলে দেখাচ্ছি! ধাঁই! ধাঁই! ধাঁই!..'

'কী হচ্ছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে।

'হয়ত আমাদের গিয়ে সাহায্য করা দরকার?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। নাতাশার দিকে বিদায়ের শেষ দৃষ্টি হেনে ছুটলাম ওপরে।

কোণের ঘরটার দুয়োর সামান্য খোলা। গ্রিগোরি ভাইপো একলাই বসে বসে 'গাধা পিটোপিটি তাস খেলছে। একলাই সে একবার নিজের হয়ে আরেক বার খেলুড়ের হয়ে দান দিচ্ছে, কেনন খেলুড়ে কেউ নেই।

'ও, এখনো জান বেরয় নি? তাহলে এই মারলাম! এই মারলাম!'

একের পর এক সায়েব মারতে লাগল সে।

'চলে আয়! ভয় নেই, চলে আয় সব!' এমনভাবে আমি হাঁক দিলাম যেন এক পাহাড়ের চুড়োয় পেঁছিয়েছি, বাকিরা এখনো নিচে।

পা বাড়ালে মিরোনভা: হুকুমের বাধ্য সে সর্বদাই।

গ্রেবও ছুটে এল ওপরে। এল নাতাশাও। দিনেমার প্রিন্স তার দেহ দিয়ে আড়াল করে রাখল মরকুটেকে।

গ্রিগোরি ভাইপো আমাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলে এবং তাস-ছড়ানো টেবিলটার ওপরেই গংজে সিগারেট নেবাল।

এ চরিত্রটি একটি প্রকাণ্ড প্রাণী, বয়স বছর পঁচিশ, তার বেশি নয়।

'দাদ্র কোলেই ও মান্ষ,' বললে গ্লেব।

বয়স্ক লোকে এককালে শিশ্ হিশেবে কেমন দেখতে ছিল তা প্রায়ই কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি... গ্রিগোরিকে কিন্তু শিশ্ হিশেবে আমি কিছ্তেই কল্পনা করতে পারলাম না। তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির বলে আমি বহ্ আগেই ব্ঝেছিলাম যে প্রতিটি লোকের মধ্যেই তার সারা জীবন ধরে ছেলেবেলাকার কিছ্ একটা টিকে থাকে: হয়ত তার চাউনিটা, নয় হাসির ধরনটা, নয় অন্য কোনো একটা ভঙ্গি। গ্রিগোরির মধ্যে কিন্তু ছেলেবেলাকার কিছ্ই নেই... তাই কিছ্তেই ভেবে উঠতে পারলাম না, কী ভাবে গ্র. বরোদায়েভ ওকে কোলে তুলতে পারতেন।

আমি আগেই বলেছি যে আমাদের ইশকুলে ডাকনাম দেওয়াটা একটা 'সম্হ বিপদ' হয়ে দাঁড়িয়েছিল; প্রায় কাউকেই তার আসল নাম ধরে ডাকা হত না। তাতে আমি এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে কারো সঙ্গে আলাপ হলে সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে তার একটা নাম ঠিক করে নিতাম। গ্রিগোরিকে আমি মনে মনে 'ভাইপো' বলে ডাকব ঠিক করলাম। এই আদরের আত্মীয় নামটা তাকে একেবারেই মানায় না: তবে প্রায়ই তো আমরা নাম দিই ঠাট্টা করে। বেঁটেদের বলি: 'এই পাগানেল!' আর ঢ্যাঙাদের: 'লাফ দে, লিলিপ্ট!'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভাইপো।

মনে হওয়া সম্ভব যে জন্মস্ত্রে সে বোধ হয় নিজের মাথাটা পায় নি: আকারে ভারি ছোট্ট সেটা। আর ম্খটায় জায়গা এত অল্প যে ঠাট্টার হাসি ছাড়া আর কিছ্রই ঠাঁই কুলত না তাতে। সব সময় হাসছিল ভাইপো।

'তা, কী তোমাদের দেখাব?'

'আমরা সব কিছ্ জানতে চাই!' বললে মিরোনভা।

'এই ঘরটাতেই ছিল সেই খেপাটা, যে উধাও হয়ে যায়। নববর্ষের রাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠল, বাস — হাওয়া। যেন মা-জননী তাকে জন্মই দেয় নি।'

সঙ্গে সঙ্গেই নোট নিতে লাগল মিরোনভা। যে কোনো বক্তৃতা, রিপোর্ট বা সাহিত্য সভায় সে প্রতিটি কথা টুকে রাখত। বক্তা যদি শ্রু করত 'নমস্কার' বলে, সেও টুকত 'নমস্কার'। শেষ করত 'নমস্কার' বলে, সেও টুকে নিত 'নমস্কার'।

'তন্ত্রীর মতো টান টান তারগ্লো তার জানলাকে প্রায় ছংয়ে গেছে...' নভেলের বিবরণটা মনে পড়ল আমার। দেখলাম, সত্যিই তারগ্লো 'প্রায় ছংয়ে গেছে'। লেখকের কল্পনা এখানে কিছ্ নেই।

'এবার সত্যি করেই আমার কল্পিত ডাকনামটাকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার!' এই ভেবে বললাম:

'মনে পড়ছে, নভেলে লেখা ছিল: 'মাঝ রাতে বাগান বাড়ির আলো নিভে গেল। সমস্ত এলাকাটা ডুবে গেল অন্ধকারে...''

'শোন ছোঁড়া, তোর ফোড়ং না কাটলেও চলবে!..' বলে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে এমনভাবে হাত নাড়ালে ভাইপো যেন মশা তাড়াচ্ছে। আর 'ছোঁড়া' বলবার সময় 'ড়'এর ওপর এমন একটা টান দিলে যার মানে হয় না।

নাতাশা কুল্যাগিনার সামনে কোনো মেয়ে যদি আমার দিকে চাইত, আর সেটা যদি নাতাশার নজরে পড়ত, তাহলে সেটা আমার ভালোই লাগত। ওর উপস্থিতিতে কেউ যদি আমার সাহায্য চাইত, কোনো একটা অংক কি উপপাদ্য বুঝিয়ে দিতে বলত, তাহলে খুশিই হয়ে উঠতাম আমি... কিন্তু কেউ যদি আমায় তাচ্ছিল্য করত তার সামনে, তাহলে ভারি কষ্ট হত।

হঠাৎ আমি সকলকে লক্ষ করেই বোঝাতে লাগলাম: 'কী জানিস, একটা কথা মনে হচ্ছে: বিজলী তখন তো ছিল না, বাগান বাড়ির বাসিন্দে তাহলে জানলা দিয়ে বেরিয়ে তার ধরে ঝুলে পড়তে পারত (সে সময় তাতে কোনো বিপদ হত না), তারপর ঝুলতে ঝুলতে সার্কাস খেলোয়াড়ের মতো গিয়ে পেঁছতে পারত প্রথম পোস্টটায়। সেটা বেয়ে মাটিতে। তারপর চিরকালের জন্যে লুকিয়ে গেল আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে। সেই জন্যই বাগান বাড়ির আশেপাশে পায়ের ছাপ কিছু ছিল না। এটা হল যাকে বলে হাইপথেসিস... মানে অনুমান আর কি।'

'কিন্তু জানলা ছিল ভেতর থেকে বন্ধ,' বললে গ্লেব।

'তাহলে অনুমানটা বরবাদ!'

'তুই যদি ছোঁড়া আবার...' শাসালে ভাইপো।

'ছোঁড়া' কথাটায় সে এমন একটা টান দিলে যে প্রায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। বুক আমার টন টন করে উঠল যন্ত্রণায়: কেননা, নাতাশা যে পাশেই।

'অনুমান বরবাদ!' জোর গলায় ফের বললাম আমি, নাতাশার সামনেই ও আমায় তুচ্ছ করছে ভেবে আমার গোটা শরীরটাই প্রায় কেঁপে উঠল। অথচ ডুয়েল লড়াও অসম্ভব, যতই হোক, আমার চেয়ে সে দুগুণ লম্বা।

ফের সে হাত নাড়ালে, যেন মশা তাড়াচ্ছে। অবিশ্যি অপমানকর কোনো উক্তি এবার সে করলে না।

আমরা নিচে নামলাম 'ক্যাঁচকেঁচে' সিঁড়িটা দিয়ে যদিও সেটা কোনো রকম ক্যাঁচ ক্যাঁচ করলে না। ভাইপো কী একটা দরজা খুলে উঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকলাম আমরাও। ঘরটা থেকে চলে যাওয়া যায় সোজা বারান্দায়, আর বারান্দা থেকে সোজা আঙিনায়।

'ভারি সুন্দর লোক ছিলেন উনি,' বললে ভাইপো, পিসির কাছ থেকে বাগান বাড়িটা ভাড়া নিতেন পুরো ছ'মাস কি এক বছরের জন্যে। ভাড়া সব অগ্রিম মিটিয়ে দিতেন। ভারি ভালো লেখক!'

'এই ঘরটায় উনি তাঁর 'পুরনো বাগান বাড়ি' লিখেছিলেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শোন ছোঁড়া, ফের যদি তুই আবার টিপ্পনি কাটিস... আবার যদি তুই...'

'বুঝেছি! বুঝেছি!' চট করে ঠেকা দিলাম আমি, 'আপনার পরিকল্পনায় বাধা দিচ্ছি বুঝি? বিশ্বাস করুন, এটা শুধু আমার কৌতূহলের তাড়ায়!'

এবারেও সে আমায় নাতাশার সামনে অপমান করে ওঠার সুযোগ পেল না।

'এখানে উনি কিছু লেখেন নি,' জানালে ভাইপো, 'বাগান বাড়ির বাসিন্দের গল্প তিনি লিখেছেন তলকুঠরিতে, মাটির নিচের ঘরটায়...'

মিরোনভা সব টুকেই চলেছে।

'মাটির নিচের তলকুঠরি আছে এখানে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'সকালে সেখানে নামতেন উনি, তারপর বাস! দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত আর পাত্তা নেই। যেন মা-জননী তাঁকে জন্মই দেয় নি... বুঝেছ তো?'

'দার্শনিক দিওগেন লিখতেন পিপের মধ্যে,' অলসভাবে বললে মরকুটে, 'আর ইনি তাহলে লিখতেন মাটির নিচের তলকুঠরিতে?'

'ওখানে উনি ভয় পেতে চাইতেন,' বুঝিয়ে বললে ভাইপো, 'জায়গাটা তো স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার...'

'বুঝেছি, অনুপ্রেরণার জন্যে!' বাহাদুরি করে বললে মরকুটে।

গ্রিগোরি ভাইপো কেন জানি তাকে ধমকালে না: 'শোন বলছি ছোঁড়া!..' বরং বলেই চলল:

'আমি ওখানে কী সব কাগজপত্র পেয়েছিলাম... ভেবেছিলাম ফেলে দেব। পিসি বললে: 'মিউজিয়মে দিয়ে আয়!' সেখানেই দিয়ে এলাম। পাশের স্টেশনে মিউজিয়ম আছে একটা।'

'বোঝাই যাচ্ছে, আঞ্চলিক ইতিহাসের মিউজিয়ম।'

এবারেও ভাইপো কোনো খেঁকানি দিলে না, বরং শান্তভাবেই বললে:

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে। কাগজে কলমে ওরা আমায় ধন্যবাদও জানিয়েছে! পাতাগুলো কাঁচের শো কেসের মধ্যে রেখে দিয়ে তার ওপর লিখেছে: 'গ্রিগোরি শাভকিন কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রদত্ত'। এখন সবাই তা পড়ে। যারা দেখতে আসে তারা আমার কথা বলাবলি করে... বুঝলে?'

'বলবে না আবার? পাণ্ডুলিপি, খসড়া!' ফের টিপ্পনি কাটলে মরকুটে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে!' সায় দিলে ভাইপো।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ করেছি যে ভাইপোর মতো লোকেরা সাধারণত কোনো এক জনকে বেছে নিয়ে কেবল তার পেছনে লাগে: 'এ্যাই, কী দেখছিস, কী? কোথায় চাইছিস? দাঁড়িয়ে আছিস যে? বসলি কেন আবার?' যদিও অন্য সকলেও ঠিক তারই মতো তাকাচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে, বসছে। কিন্তু ভাইপোর মতো চিজেরা কেবল একজন কাউকেই বেছে নেয়, এবং সাধারণত সবচেয়ে সুপুরুষ ও বুদ্ধিমান লোককেই। ভাইপো বেছে নিলে আমায়:

'এই ছোঁড়া, মেঝের দিকে চেয়ে আছিস যে? শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে না?'

'ও নিশ্চয় কিছু একটা ভাবছে,' বললে মরকুটে।

কৃতার্থের মতো সবাই চাইলে ওর দিকে: যেন আমায় বাঁচিয়ে দিয়ে মহা উপকার করেছে। এ একেবারে অসহ্য!

'শীগগির চল ওখানে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'তলকুঠরিতে!.. লেখকের লেখার ঘরে!'

'পিলে না চমকালে — বেশ, চলো!' বললে ভাইপো।

কেন জ্যানি আমার এ প্রস্তাবে তাকে চটতে দেখা গেল না। পরে আমি বুঝেছি, কেন। তবে সেই মুহূর্তে... সেই মুহূর্তে কোনো টনক আমার নড়তে চাইছিল না, যদিও সাধারণভাবে টনক আমার নড়ে ওঠে আপনা থেকেই।

মরকুটে ফ্যাকাশে হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে এ পা ও পা করতে লাগল।

'ভয় লাগছে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি, তবে এমনভাবে যাতে নাতাশারও কানে যায়। মেয়েটার চোখ খুলে দেওয়া উচিত!

সিঁড়ি দিয়ে নামলাম আমরা, পা পিছলিয়ে যাচ্ছিল: হয়ত স্যাঁৎসেঁতে বলে, হয়ত ছাতা পড়েছে... দুরু দুরু আনন্দে আমি উত্তেজিত: এই ধরনের সিঁড়ি বেয়ে তলকুঠরিতে নামে কেবল সত্যিকারের গোয়েন্দারা। নামে তারা এই জেনেই যে হয়ত জীবনেও আর উঠতে হবে না!

'ওহ্, কোনো একটা বিপদ যদি ওখানে একবার ঘটে!' স্বপ্ন দেখতে লাগলাম আমি। 'ভয় পেয়ে নাতাশা তাহলে ছুটে যেত মরকুটের দিকে নয়, আমার দিকে, আমি তার উদ্ধারের পথ বার করতাম। বাঁচাতাম তাকে! কিন্তু কপাল খারাপ... গ্র. বরোদায়েভ যখন এখানে প্রত্যেক দিন নামতেন, তখন বিপদের কিছু এখানে থাকা সম্ভব নয়। নাতাশাকে আমি দেখাতেও পারব না যে...'

'এই ছোঁড়া, ফের তুই ওই... আগুবেড়ে ছুটছিস? আলো জ্বালি, দাঁড়া!'

সুইচ টিপলে সে। এবং যা হওয়া উচিত, মরচে ধরা লোহা বাঁধানো আধখোলা দরজাটার ফাঁক দিয়ে পিছলে এল এক ফালি মিটমিটে আলো। গ্র. বরোদায়েভের নভেলে আলো সর্বদাই 'পিছলে আসত' আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে, নয়ত অন্ধকারে কোনো কিছুর ওপর 'বিষণ্ণের মতো লুটিয়ে' ফের দরজা বন্ধ হবার সময় 'পিছলে ফিরে যেত'। কথাগুলো আমার বেশ ভালো মনে আছে।

দরজার পাল্লা পুরোপুরি খুলতে ভাইপোর বেশ বেগ পেতে হল। কঁকিয়ে উঠল তেল-না-দেওয়া কব্জাগুলো। গ্র. বরোদায়েভের নভেলে দরজার সমস্ত কব্জাই ছিল তেল না দেওয়া এবং সর্বদাই তা কঁকিয়ে উঠত। এটাও বেশ মনে আছে আমার।

সুতরাং খাঁটি ডিটেকটিভ বইয়ের মতো সবই একেবারে চমৎকার!

'সেঁধোও এবার!' বললে ভাইপো।

সবার আগে গেল মিরোনভা: কারো একটা আদেশ শোনা মাত্র তা সে পালন করতে ভালোবাসত। তলকুঠরিতে আমাদের ঢুকিয়ে দিলে ভাইপো। সব শেষে এল মরকুটে... আমার ভারি ভালো লাগল ঘরের ছাতা পড়া পচা গন্ধটা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম আমি।

হঠাৎ কঁকিয়ে উঠে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। তারপর লোহায় লোহায় ধাক্কার শব্দ। হুড়কো এঁটে দিলে ভাইপো। ও রয়ে গেল দরজার ওপারে, মনে হল যেন সে দরজা বুঝি বন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মতো!..

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যাতে পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, আমার কাছে সবই অস্পষ্ট

অজান্তেই এক প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বসল আমায়। তবে সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। পরের সেকেণ্ডেই তা ঝেড়ে ফেললাম। বলা ভালো, ছুড়ে ফেললাম।

কেননা নাতাশা যে ঠিক আমার দিকেই এগিয়ে আসার জন্যে পা বাড়ালে। সামান্য একটু পা বাড়ালে বটে, এমনিতে চোখে পড়বার মতো নয়, তবে আমি ঠিকই নজর করলাম। বলা ভালো, টের পেলাম। সাধারণত, এমন যদি কেউ থাকে যাকে তোর ভালো লাগে, তাহলে নজর তো থাকে কেবল তার দিকেই, সকলের উদ্দেশেই বলছি ভাব করলেও বলিস তো কেবল তার জন্যেই। নজর করে যাস কী সে করছে। গুণে যাস কতবার সে তোর দিকে তাকাল। যে কখনো ভালো-বেসেছে, সে আমায় সহজেই বুঝবে!

'এই বিপদের মুহূর্তটায় ও থাকতে চায় আমার পাশে!' স্থির করলাম আমি, 'চাইছে আমি যেন ওকে বাঁচাই, নিজের দেহ দিয়ে ওকে ঘিরে রাখি!'

ওহ, কত বারবারই না আমরা বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলি আমাদের ইচ্ছের সঙ্গে!..

'পাঁচটায় যে ট্রেনটা ছাড়ে তাতে আমায় ফিরতে হবে,' বললে নাতাশা।

'আমায় ফিরতে হবে...' এটুকুও বললে না যে, 'আমাদের ফিরতে হবে'।

ভাবলাম, 'মায়ের জন্যে ওর ভাবনা হচ্ছে।' আর কী আশ্চর্য: সেই মুহূর্তে ওর মায়ের জন্যে আমার ঈর্ষাই হল, যদিও ওর মায়ের হার্ট খারাপ অথচ আমার হার্ট খুবই ভালো, তাই বিবেচনা করে দেখলে ওর মায়েরই হিংসে হওয়া উচিত আমার ওপর। কিন্তু বিবেচনার আমি পরোয়া করলাম না।

'গ্রিগোরি ভাইপো ঠাট্টা করছে,' বললাম নাতাশাকে, 'সে আর বুঝলি না?'

'তাহলে দরজা খুলে দিক,' বললে নাতাশা।

ওর ইচ্ছা আমার কাছে আদেশ! কিন্তু ভাইপোর কাছে তো আর আদেশ নয়।

মিনতি করলাম, 'দরজা-টা খুলুন-না!'

'এটা ছোঁড়া তুই?' শোনা গেল দরজার ওপাশ থেকে, 'ফের আবদার শুরু করেছিস? সবাই চুপচাপ বসে আছে, যেন মা-জননী কখনো জন্মই দেয় নি.... আর তুই ছটফট লাগিয়েছিস!'

খুব আস্তে আর বিছছিরিভাবে হেসে উঠল সে।

'খুলুন বলছি, এক্ষুণি!' হুকুম করলাম আমি। চেয়ে দেখলাম নাতাশার দিকে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। মুখটা ওর দেখতে পেলাম না, কেননা মিটমিটে যে বাতিটা ভাইপো জ্বালিয়েছিল, সেটা ছিল দূরে, তলকুঠরির কোন ভেতর দিকে।

'তুই না জানতে চেয়েছিলি লোকটা কোথায় উধাও হল?' জিজ্ঞেস করলে ভাইপো। 'তা এইবার জানবি!'

'ওর মতলবটা কী?' ধাক্কা দিলাম গ্লেবের কাঁধে।

'বুঝতে পারছি না,' বললে গ্লেব।

হঠাৎ দরজার ওপারে পায়ের শব্দ কানে এল। ওপরে উঠে যাচ্ছে ভাইপো। তলকুঠরিতে আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল সে।

শুরু হল ভয়াবহ কাণ্ড!

'থামুন! থামুন!' কাতর স্বরে কাকুতি করলে মরকুটে।

জবাবে শোনা গেল ভাইপোর দুমদাম পায়ের আওয়াজ।

ফের গ্লেবের কাঁধ চেপে ধরলাম আমি।

'ফেরা ওকে, ডেকে আন!..'

'কে ওকে ফেরাবে বল?'

'চেঁচা!' নিজের নার্ভাসনেস চাপা দেবার জন্যে বললাম ফিসফিসিয়ে, 'ঘর ফাটিয়ে চেঁচা!'

'কানেই যাবে না... ওপরে উঠে গেছে... সেখানে কোনো শব্দই... দরজা যে লোহার... যতই চেঁচা...'

'চাবি নেই তোর কাছে?'

'কারো কাছেই নেই... হারিয়ে গেছে... বিলিতি তালা: দরজা টানলেই আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়... খোলা যায় ওপাশ থেকে... সেখানে হুড়কো আছে কিনা...'

'জীবন্ত সমাধি?' মৃদু স্বরে বললে মরকুটে, 'প্রাণে বাঁচব তো?'

আইদা আর রাদামেসের* কাহিনী মনে পড়ল আমার। জীবন্ত তাদের সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এবং ফের তাকালাম নাতাশার দিকে। ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল যেন সে-ও আমাদের ভাগ্যটাকে মনে মনে তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখে! কিন্তু ভাবছিল সে কেবল ট্রেনের কথা। সে আমি বেশ জানি। তাছাড়া, তুলনাই বা করা যায় কী করে? কেননা আইদা আর রাদামেস ছিল মাত্র দু'জন। আর এখানে আমরা পুরো ছয় জন।

'আরে না, না, মন খারাপ করিস না!' বললাম নাতাশাকে, 'এখান থেকে তোদের আমি উদ্ধার করবই। ফের আলোর মুখ দেখবি!'

একটু যেন ভয় পেয়ে সে চাইল আমার দিকে। তখন আমি যোগ দিলাম:

'সব ঠিক হয়ে যাবে!'

আমার কেবলি ইচ্ছে হচ্ছিল বিপদটার মুখোমুখি হয়ে নাতাশা আরো কাছিয়ে আসুক। নাতাশা কিন্তু কাছিয়ে এল না: কেবলি ট্রেনের কথা ভাবছিল সে।

'আমায় বাড়ি পেঁছতে হবে ছ'টার আগেই।'

'পেঁছবি!'

চারিদিকে চেয়ে দেখলাম আমি...

মিটমিটে বাতিটায় অন্ধকারের এক একটা জিনিসে বিষণ্ণ আলো পড়েছে। আলো পড়েছে

---

* মিসরের ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে রচিত ভের্দির অপেরা 'আইদা'র নায়ক নায়িকা।

রহস্যজনক গোল টেবিলটায়, আমার ধারণা, যৌবন কালে ওটা নিশ্চয় বাগানের লতাকুঞ্জে কোথাও পাতা হত। এখন তার তিনটে ঠ্যাং। গোমড়া মুখে টলে আছে শূন্য চতুর্থ ঠ্যাংটার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে রহস্যজনক একটা চেয়ারের ওপরেও আলো পড়েছে, তারও তিনটি ঠ্যাং, ফলে টেবিলটার দুঃখু হবার তেমন কারণ থাকছে না। দুর্বোধ্য কোন এক অপশক্তি মাটিতে অদ্ভুত সব প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে রেখেছে... দেয়ালের একটা জায়গায় প্রহেলিকার মতো একটুকরো প্লাই উড আঁটা, সেখান থেকে থমথমে চোখে আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে আছে কয়েকটা ছমছমে কথা: 'সাবধান! কাছে আসিবে না!' তার নিচে জাঁকালো করে আঁকা আছে আড়াআড়ি দুটি হাড়ের ওপর নর-করোটি।

ওখান দিয়ে যাবার সময় নাতাশার ফ্রকটা ওখানে খানিকটা ঘসটে গিয়েছিল। তাতে রঙের কালো দাগ লেগে গেল তার ফ্রকে। বোঝাই যায় এই স্যাঁতসেঁতে কবরের মধ্যে ও রঙ কখনো শুকিয়ে ওঠার ফুরসুত পায় নি।

'সাবধান! কাছে যেও না!' চেঁচিয়ে উঠল গ্লেব।

সবাই কেঁপে উঠে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল। এমন কি অভিজ্ঞ দৃষ্টি না থাকলেও নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যেত যে সকলেই একেবারে দমে গেছে।

আমি ইচ্ছে করে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে গ্লেবের সঙ্গে খানিক ফিসফাস করে জোরে ফুর্তির সঙ্গে ঘোষণা করলাম:

'আরে, এইত গ্লেব বলছে যে প্রায়ই ভাইপো এই ধরনের ঠাট্টা করে। প্রথমে আটকে রেখে পরে খুলে দেয়।'

'কিন্তু খুলবে কতক্ষণ পর?' জিজ্ঞাসা করলে মরকুটে।

'এক ঘণ্টা বাদে! বড়ো জোর দু'ঘণ্টা!' চাঙ্গা গলায় জানালাম আমি। 'আর আপাতত আয় চারদিকটা ঘুরে ফিরে নজর করি! এই তলকুঠরির দর্শনীয় জিনিসগুলো দেখে নেওয়া যাক... তাতে পরে যখন ওপরে উঠব, তখন গল্প করার মতো কিছু থাকবে।'

'কিন্তু ওপরে উঠব তো?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে।

'নিশ্চয়! আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন...'

'কিন্তু দেখা হবে তো তাঁদের সঙ্গে?'

অন্ধকারের মধ্যে বাতিটার আলো পড়ছিল কেবলি নাতাশা. কুলাগিনার মুখে। মানে, আমিই থেকে থেকে ওকে দেখছিলাম আর কি।

'কাকে তুই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে সে।

ইচ্ছে হল বলি 'তোকে!' কিন্তু আমায় সে বিশ্বাস করত না, কেননা কথাটা ঠিক না। যাই বলি, সবচেয়ে বেশি আমি ভালোবাসি মা আর বাবাকে। তারপর দাদা কস্তিয়াকে... তারপর নাতাশা।

কিন্তু সে তো আর তাকে বলা যায় না!

'কাকে তুই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসিস?' ফের বললে সে।

'এমনি সাধারণভাবে... নাকি আমাদের ক্লাসে?'

'বড়ো বললেন! ক্লাসে! তাহলে চক্রটাই বা নয় কেন?'

'আর তুই কাকে ভালোবাসিস?'

'মাকে।'

'আমিও মা আর বাবাকে।'

'মা আর বাবাকে নয়, কেবল মাকে। মা'র জন্যে মরতে পারি। আর তুই মরতে পারিস কারো জন্যে?'

'পারি, তোর জন্যে!' মুখ থেকে কথাটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল আর কি। কিন্তু কেমন যেন আটকে গেল।

'পারিস? মা'র জন্যে?..'

'আমি ঠিক ভেবে দেখি নি...'

'সেটা ঠিকই করেছিস: মায়ের কাছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হল ছেলেমেয়েদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকা...'

'তোর এই আইডিয়াটা তোর টুকে রাখা উচিত!'

'আইডিয়া আবার কোথায়? সত্যি কথা, বাস... সেই জন্যেই আমায় পাঁচটার ট্রেনে ফিরতে হবে।'

'তাই যাবি! কথা দিচ্ছি তোকে!..'

কিন্তু কী করে ওকে এই তলকুঠরি থেকে বার করে আনব, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল না। 'ওহ্, কিছু একটা যদি মাথা খাটিয়ে বার করতে পারতাম!' মনে মনে ভাবলাম আমি, 'তাহলে আমায় সে ভাবত উদ্ধারকর্তা, বীর, যে মায়ের জন্যে সে মরতে রাজী, তাঁর জীবন-রক্ষক!'

'আধ ঘণ্টা আগের ঘটনাগুলোকে এখন মনে হচ্ছে চমৎকার। বলতে কি, অপরূপ,' বললে নাতাশা, 'ভালো জিনিসের সত্যিকার দাম বোঝা যায় কেবল খারাপের প্রেক্ষাপটে। লক্ষ করেছিস তুই?'

'নিশ্চয়, করি নি আবার!.. কত বার! এই আইডিয়াটা তুই নিশ্চয় লিখে রাখবি!..'

নাতাশা কথা বলছিল প্রায় ফিস ফিস করে। কিন্তু তার প্রত্যেকটি কথাই আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কেননা ও যখন আমায় কিছু বলতে চায়, তখন আমার কানদুটো কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। সে সময় কাছেই যদি বোমা ফাটে বা বজ্রপাত হয়, তাহলেও আমার কানে যাবে কেবল তারই কথা।

'অদ্ভুত ব্যাপার,' হঠাৎ মাথায় খেলে গেল আমার, 'মাকে আমি বেশি ভালোবাসি, কিন্তু কই, সারা দিন ধরে তাঁর কথা তো ভাবি না। আর নাতাশাকে ভালোবাসি কম, অথচ সারাক্ষণ কেবল তার কথাই ভাবি। ওহ্, জীবনের কত ব্যাপারই যে এমন দুর্বোধ্য!'

তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির বলে আমি ধরতে পারলাম যে নাতাশা কথা কইছিল কেবল আমার সঙ্গেই। এর ফলে একটু একটু করে মনের যে জোর উবে যাচ্ছিল তা ফিরে এল। ফের তৈরি হয়ে উঠলাম দু'পায়ে দাঁড়াতে, লড়তে, উদ্ধারের উপায় খুঁজতে। মানে, তলকুঠরি থেকে বেরতে।

অন্ধকারের মধ্য থেকে মরকুটের মুখটা ধরা পড়ল বাতিটায়। তবে ধরা না পড়লেই ভালো হত: ফ্যাকাশে ঠোঁট ওর কাঁপছিল।

ঠিক করলাম মরকুটেকে চাঙ্গা করা যাক।

'উদ্ধার দল গড়া যাক,' বললাম আমি।

'নিজেরাই নিজেদের উদ্ধার করব?' তো-তো করে বললে মরকুটে।

'নিশ্চয়! আর তুই যাবি আমার সঙ্গে আগে আগে। কোথাও এখানে একটা বেরুবার পথ থাকার কথা। অন্তত দেয়াল ফুঁড়ে বেরনো যায়। 'কাউণ্ট মণ্টে ক্রিস্টো' বইটায় যেমন আছে। মনে আছে তোর, মরকুটে? এদমন দান্তেস আর মোহ্যন্ত ফারিও দেয়াল ফুঁড়ে গিয়ে মেলে। তাতে আবার সেটা কোনো বাগান বাড়ি নয়। কেল্লা! দেয়াল সেখানে অনেক মজবুত।'

'তাদের তো খাওয়া দিত। আমরা না খেয়ে মরব।'

মরকুটের কাঁধে হাত রাখল দিনেমার প্রিন্স। গ্লেব মনে হল পর্যবেক্ষণ করছে মাটির মেঝেটা, যা অবশ্য দেখা যাচ্ছিল না।

'আরে, আলিক তো আগেই বলেছে যে গ্রিগোরি ভাইপো শুধু ঘণ্টা খানেক, কি বড়ো জোর দু'ঘণ্টার জন্যে ঠাট্টা করছে,' বোঝালে মিরোনভা।

মনে হল কেবল ওই একলাই তার মনের শান্তি বজায় রেখেছে। এখন ও দলপতি হিশেবে ধরেছে আমাকে, এবং দুর্ভাবনা করার হুকুম আমি কিছু দিই নি: সুতরাং সেও কোনো দুর্ভাবনা করছে না।

'নিশ্চয় ভাইপো দুয়োর খুলে দেবে, তুই ঠিকই বলেছিস,' বললাম মিরোনভাকে, 'কিন্তু তার সাহায্যের জন্যে আমাদের বসে থাকতেই হবে এমন কি কথা আছে? নিজেদের জোরেই উদ্ধার পেতে হবে, এই হল আমাদের কর্তব্য!'

আমার একথায় হাসল নাতাশা, অল্প একটুখানি হাসি ফুটেছিল তার, আধা অন্ধকার থাকলেও সেটা আমার চোখে পড়ল। তা তো হাসবেই: কথা বলছিলাম আমি এমনভাবে যেন মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দিচ্ছি। কিন্তু সবাইকে তো চাঙ্গা করে তোলা দরকার, সাহস দেওয়া দরকার!

'তার চেয়ে বরং চ্যাঁচালে হয় না?' প্রস্তাব দিলে মরকুটে, 'কারো না কারো কানে যাবে...'

'বাগান বাড়িটায় যে... এলাকাটাতেও কেউ...' বললে গ্লেব। কথা সম্পূর্ণ করার গুণ হঠাৎ ওকে ছেড়ে গেল আবার।

আমি বললাম: 'চল্! সামনে!' মরকুটের হাত চেপে ধরে সামনে এগুলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল নাতাশার হাতখানাও ধরি, তবে সাহস হল না।

চললাম আমরা মাটির তলাকার কুঠরি দিয়ে। ওপর থেকে টপ টপ করে পড়ছিল কনকনে ঠাণ্ডা জলের ফোঁটা। মাঝে মাঝেই পা হড়কাচ্ছিল সব বিশ্রী খোঁদলে। সূচীভেদ্য অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরল ডাকিনীর মতো। মিটমিটে বাতিটার অনিশ্চিত আলোটা পড়ে রইল বিষণ্ণ কোন এক সুদূরে... স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধটায় এখন আর আমার আনন্দ হচ্ছিল না, বুক ভরে তা নিঃশ্বাস নেবারও সখ হল না।

'ডিটেকটিভ বই পড়া আর ডিটেকটিভি করা এক জিনিস নয়,' স্থির করলাম আমি, 'ভেবেছিলাম ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিয়ে খেলব, আর হঠাৎ সত্যিকারের এক বিভীষিকাই নেমে এল এখানে। শুধু দেখানো চলবে না যে আমারও দুর্ভাবনা হচ্ছে... গ্রিগোরি ভাইপো কি আসবে? দরজা কি খুলবে? আর দরজাটা বন্ধই বা করল কেন? কী তার উদ্দেশ্য? 'লোকটা কোথায় উধাও হয়েছিল জানতে চেয়েছিলি? বেশ, জেনে নে!'—তার এ কথার অর্থই বা কী?'

'মড়া!!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মরকুটে।

থর থর করে কাঁপছিল সে। ভাবলাম, 'নিশ্চয় পাগলা হয়ে গেছে। নার্ভ আর সইতে পারল না।'

'বাড়া... সোজা তুই... আমার মতো...' ওর ওপরের ঠোঁটের সঙ্গে নিচের ঠোঁট ঠেকছিল না। গ্লেবের মতো সেও কথা শেষ করতে পারছিল না।

আমি হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলাম... কঙ্কাল। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার খুলি, পাঁজরার হাড়... এবার আর আঁকা টাঁকা কিছু নয়, জলজ্যান্ত...

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'পেছনে ফের!'

মিটমিটে বিষণ্ণ বাতিটার অনিশ্চিত আলোর দিকে ছুটলাম আমরা। কিন্তু এখন সেটাকে মনে হচ্ছিল যেন আস্তো এক সূর্য।

হঠাৎ আমার মাথায় টনক নড়ল: 'এই ভাবেই তাহলে মারা গেছে সেই বাগান বাড়ির বাসিন্দে! উধাও হয়েছে সে তাহলে এইখানেই!..'

আমাদের কপালেও কি সেই একই নির্বন্ধ?

৭ম পরিচ্ছেদ

যাতে ফের উপন্যাসের নায়কদের সঙ্গে পরিচয় হবে, যারা সবাই অবশ্য নায়ক হয়ে উঠবে না

'অতএব নিয়তির নির্বন্ধ ছিল এই যে পুরনো বাগান বাড়ির ভয়ঙ্কর রহস্য আমি ভেদ করব বটে, তবে সেই রহস্যের সঙ্গেই সমাধিস্থ থাকব,' কথাটা ভেবে গা হিম হয়ে এল। কিন্তু পরের মুহূর্তেই বুঝলাম যে মুহূর্তের জন্যেও ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করার অধিকার আমার নেই এবং গরম হয়ে উঠলাম। কেননা পাশেই ছিল নাতোশা এবং অন্যান্য সবাই... ওদের বাঁচাতে হবে আমায়। আর আপাতত ওদের চাঙ্গা করা, অন্তত খানিকটা চাঙ্গা করা দরকার।

আমি যে রহস্য ভেদ করেছি সেটা কেউ জানত না। ওটা রইল একলা আমার কাছেই।

নিজের মনের মধ্যে হালকা ভাবনা নিয়ে একলা দিন কাটানো যায়। কিন্তু ভাবনাটা যখন হয় গুরুতর, তখন সেটাকে একলা বইতে মন চায় না, ইচ্ছে হয় কারো পরামর্শ নিই, কারো সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু কারো পরামর্শ নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব! সত্য আমায় গোপন রাখতে হবে।

'কঙ্কাল ফঙ্কাল কিছুই নয়! মরকুটের ওটা চোখের ভুল...'

'নয় মানে?' তো তো করে বললে মরকুটে, 'আর পাঁজরাগুলো?'

'দৃষ্টিবিভ্রম!'

'অন্ধকারে দৃষ্টিবিভ্রমের কথাই আসে না।'

'তুই কি ভেবেছিস বিভ্রম হয় কেবল চোখের বেলায়? কী তুই খোকা! শ্রুতিবিভ্রমও হয়, জানিস? তোর যা হয়েছে, সেটাকে বলা যায় স্পর্শবিভ্রম।'

'তাহলে 'পেছনে ফের' বলে চ্যাঁচালি কেন?'

'তোর দৃষ্টিবিভ্রম যাতে অন্যদের মধ্যে না ছড়ায়। একটা কুদৃষ্টান্ত, মানে সে তো জানিসই...'

'তার মানে কী... আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

থর থর করে উঠল মরকুটের ঠোঁট।

দিনেমার প্রিন্স ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরে বললে:

'সমস্ত অস্বাভাবিক লোকই নিজেকে ভাবে স্বাভাবিক। আর সমস্ত স্বাভাবিক লোকেরই মনে হয় সে বুঝি অস্বাভাবিক। তাই ভাবনা করিস নে। শোন, আমার মাথায় কয়েকটা ভাবনা খেলে গেল। হয়ত তোর ভালো লাগবে?'

এই বলে সে জোর গলায় আবৃত্তি করতে লাগল, যদিও নিজের কবিতা আগে সে কখনো পড়েও শোনায় নি।

এই যে দিনে তলকুঠরির গর্ভে,
অন্ধকারে স্যাঁতস্যাঁতানির মধ্যে
রইনু পড়ে, ভয় তবু কে করবে?
বীরের মতো ঘোষণা করি পদ্যে:
'তলকুঠরি, দুহাত করে ভর্তি
দাও আমাদের আনন্দ আর ফূর্তি!..'

লজ্জা-লজ্জা চোখে দিনেমার প্রিন্স চেয়ে দেখল সবার দিকে। কিন্তু আনন্দ আর ফূর্তি কারো মধ্যে দেখা গেল না। শুধু আমি ছাড়া।

'চমৎকার!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'আমাদের সক্কলের মেজাজটা তুই খাসা ধরেছিস!'

আমার পরে মিরোনভাও হাসলে। বাকি কারো মুখে হাসি ফুটল না।

'দৃষ্টিভ্রম হয় কী করে? কিন্তু পাঁজরাগুলো?..' মরকুটের সন্দেহ আর যাচ্ছিল না।

আমি ওকে একপাশে টেনে আনলাম। বললাম:

'মরকুটে, পৌরুষ হারাস নে! দেখছিস না, মেয়েরা রয়েছে। ওদের কথা ভাব।'

'তার মানে, এই সেই... বাগান বাড়ির বাসিন্দে?'

'তারই কঙ্কাল। আমার তাই ধারণা। বাকি যা আছে, তা ওইটুকুই... কিন্তু জিনিসটা গোপন রাখিস। আমাদের সঙ্গে যে মেয়েরা রয়েছে... সাহস রাখ!'

'দেখি...' বললে ফ্যাকাশে মরকুটে।

'আসলে আমরা এখন রয়েছি লেখকের লেখার ঘরে!' হঠাৎ সকলকে উদ্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, 'মরকুটে কিছু আগে আমাদের বলছিল কোন এক গ্রীক দার্শনিক নাকি রচনা করতেন পিপের মধ্যে বসে। সবাই তোরা তো শুনেছিস? আর গ্ল. বরোদায়েভ রচনা করে গেছেন মাটির নিচে। ভাইপো যতক্ষণ তার বোকাটে রসিকতা চালাবে, ততক্ষণ, আয় আমাদের সাহিত্য চক্রের একটা চলমান আসর বসানো যাক, একেবারে এইখানে, লেখকের লেখার জায়গাটাতেই। বলা যায়, স্রেফ তাঁর কামারশালায়!' টেবিলটা তুলে শূন্যে খানিকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফের সেটাকে যথাস্থানে বসালাম। 'মরকুটে, প্রিন্স আর মিরোনভা কিছু একটা করে লিখুক। চলতি প্রসঙ্গ নিয়ে! সেটা ওরা চট করে লিখে দেবে।'

মিরোনভা হাত তুললে। বললে:

'প্রিন্স তো আগেই...'

'তাতে কী, আরো কিছু লিখুক! ওর তো সময় বেশি লাগে না, আর গ্লেব তার দাদুর জীবনের কোনো একটা ঘটনা শোনাক।'

নাতাশার কব্জিতে ঘড়ি ছিল। হাতে ঘড়ি থাকলে সবাই কেবল ঘড়ির কথা ভাবে, হাত তুলে দেখে, যেন সর্বদাই ভয়ঙ্কর একটা তাড়া আছে তাদের। নাতাশা কিন্তু ঘড়ি দেখল অলক্ষ্যে, স্রেফ একবার চোখ নামিয়ে।

'পাঁচটার ট্রেন...' বললে সে, 'তোর ওপর কিন্তু ভরসা করে আছি, অ্যালিক!'

আমার ওপর ভরসা করে আছে সে। গ্লেবের ওপর নয়। মরকুটের ওপর নয়। প্রিন্সের ওপর নয়। আমার ওপর! সেই মুহূর্তে ইচ্ছে হল ধন্যবাদ জানাই ভাইপোকে, ভাগ্যিস সে আমাদের তলকুঠরিতে বন্ধ করে রেখেছে। কেননা সে আমাদের বন্ধ করে না রাখলে এ কথাগুলো আমি জীবনেও শুনতে পেতাম না।

'ওদের একটু ব্যস্ত রাখা যাক,' বললাম নাতাশাকে, 'কিছু একটা লিখুক, সেই সুযোগে আমি খানিকটা তলিয়ে ভেবে দেখি! পথ বার করতে হবে!.. বিশ্বাস কর, তোর ভরসা বৃথা যাবে না। ট্রেন আমরা সময়মতোই ধরব!'

কিছুই জবাব দিলে না সে।

'তাহলে চক্রের বৈঠক শুরু হচ্ছে,' উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলাম আমি, 'দ্যাখ, প্রত্যেকেরই হবে আলাদা আলাদা কাজের জায়গা: প্যাকিং বাক্স আছে ঠিক পাঁচটা।'

হাত তুললে মিরোনভা। বললে:

'কিন্তু আমরা যে ছ'জন।'

'আমি বসব না। পায়চারি করে বেড়াব...'

আমার ধারণা ছিল, নামকরা গোয়েন্দাদের এমন এক একটা অভ্যাস থাকে যাতে ভেবেচিন্তে কোনো রহস্য ভেদ করতে সাহায্য হয়। কেউ যেমন সে সময় নির্ঘাৎ পাইপ ধরায় — উপকার হয় তাতে। আমায় কিন্তু অবশ্য অবশ্যই পায়চারি করে বেড়াতে হবে। লোকে যদিও বলে যে,

কাজ হয় পা দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে, আমি তো প্রায় পায়ের দৌলতেই রহস্য ভেদের কাজটা হাসিল করে এনেছি।

পিঠের দিকে হাত রেখে পায়চারি করতে লাগলাম আমি। বাকি সবাই প্যাকিং বাক্‌সগুলোর ওপর বসলে।

নাতাশা স্রেফ বসে রইল। গ্লেব কুঁজো হল, যেন সে তার ক্লাসের শেষ বেঞ্চিটাতেই বসে আছে, ভয় পাচ্ছে এই বুঝি তার ডাক পড়বে ব্ল্যাক বোর্ডে। মিরোনভা সঙ্গে সঙ্গেই তার খাতা খুলে লিখতে শুরু করে দিলে। আমি নিশ্চয় জানতাম যে সে তার পরবর্তী স্কেচ লিখছে। দিনেমার প্রিন্সের ঠোঁট নড়তে লাগল আর তার লম্বা হাতদুটো যেন তার কথার সঙ্গে তাল রেখে নড়াচড়া শুরু করলে। কথা অবিশ্যি শোনা যাচ্ছিল না, মনের কোন গহীনে তখন তা ছন্দিত পঙক্তিতে সারি দিচ্ছিল।

মরকুটের চেহারাটা ঠিক মড়ার মতোই। আমি গেলাম তার কাছে।

ও বললে, 'এবার মরণ...'

'তার মানে তোর বরাবরের সাধ মিটবে!'

'কিসের সাধ?'

'অনেক দিন থেকেই তো তুই মরতে চাইছিস।'

'আরো কয়েকটা দিন বাঁচলে হত...' ফিস ফিস করলে সে।

'আমি একটা উদ্ধারের উপায় ভেবে বার করছি। আর তুই ততক্ষণ কলম ধর। অন্য দিকে মন ফেরা! তোর ওই ই. ষ.'কে নিয়েই না হয় একটা পদ্য লেখ।'

'ও তো আর পড়বে না...'

'কেন না? কোনো দিন হয়ত লোকে আমাদের কঙ্কাল খুঁজে পাবে। তোর কঙ্কালের পাশে থাকবে তোর পদ্য। মেয়েটা তা পড়বে, দীর্ঘশ্বাস ফেলবে চুপি চুপি...'

'ফেলবে না।'

'কেন?'

'কারণ ই. ষ. বলে কেউ নেই...'

'নেই মানে?'

'নেই... অস্তিত্বই নেই। জীবনের এই অন্তিম মুহূর্তে তোর কাছে আর মিথ্যে বলে কী লাভ?'

'আর অন্য মেয়েটি? অ. হ.?.. সেও নেই?'

'সেও।'

'আর আ. স.?'

'সেও...'

'তার মানে কি, সামনে যে অক্ষর চোখে পড়ত তাই বেছে নিতিস?'

'তা কেন, আমার ছিল নিজস্ব একটা কাব্যরীতি, নিজের পদ্ধতি।'

'কিসের পদ্ধতি? খুলে বল তো। যতই করি, জীবন তো আমাদের আর অল্পই বাকি...'

'সেই জন্যেই বলছি। হ্যাঁ, নিজের একটা পদ্ধতি ছিল আমার! বর্ণমালার প্রথম আর শেষ অক্ষর নিতাম। তারপর দ্বিতীয় আর শেষ থেকে দ্বিতীয়। গোড়া থেকে তৃতীয়, শেষ থেকে তৃতীয়। এই ভাবেই দাঁড়ায়: 'অ. হ.', 'আ. স.', 'ই. ষ.', বুঝেছিস?'

'বর্ণমালা তুই খাসা রপ্ত করেছিস। প্রেম ট্রেম তাহলে কিছু ছিল না?'

'থাকবে না কেন? প্রেমে পড়তাম, মরতে চাইতাম, তারপর প্রেম জুড়িয়ে আসত, স্বাভাবিক হয়ে যেতাম, ফের প্রেমে পড়তাম!'

'প্রেমিকা ছাড়াই?'

ওহ, জগৎপারাবারে কত জিনিসই না কত আশাতীত ও দুর্জ্ঞেয়!

'কেন, সাহিত্যে কি এটা নতুন? অন্যান্য কবিরাও কি তাদের প্রেমিকার মূর্তি বানিয়ে নেয় নি, কল্পনা করে নি? ঠিক বাস্তব লোক হিশেবেই কি তাদের দেখায় নি?'

'তা তো আমার জানা ছিল না।'

'নাই বা জানলি, আন্দাজ করতে তো পারতিস!

'উঁহু, আন্দাজও করতে পারি নি।'

'তুই একটা কী রে! এটা কি ভারি স্পষ্ট নয়?..'

'কী?'

'মানে, কল্পিত মূর্তি প্রায় সর্বদাই সত্যির চেয়ে ভালো।'

'নে, মাপ কর...'

'কী করে মাপ করব, যখন সাধারণ জিনিসগুলোও তুই বুঝিস না?'

ফের ওর সেই প্রশ্ন করে জবাব দেবার চালটা ফিরে এসেছে। একেবারে সইতে পারি না এটা। ভাব করত যেন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না, কী করে আমি কোনো একটা জিনিস না জেনে, না শুনে, না পড়ে আছি।

'শোন মরকুটে, অন্তত এই অন্তিম সময়টাতে একটু মানুষের মতো কথা বল,' বিরক্তি না চেপেই বললাম আমি, 'ইচ্ছে হয় বুঝিয়ে বলবি, ইচ্ছে না হয়...'

'কেনই বা ইচ্ছে হবে না?'

'ফের ওই প্রশ্ন...'

'শোন বলি, প্রত্যেক লোকেরই কথা বলার এক একটা নিজস্ব ধরন আছে। এটা হল তার মৌলিকতা। তুই কি এটাও...'

আমি সরে যাবার জন্যে দৃঢ় ভঙ্গিতে পা বাড়ালাম।

'যাস না!' মরকুটে আমার হাত চেপে ধরল, 'সব তোকে বুঝিয়ে বলছি এক্ষুনি... বলা যায় না, দৈবাৎ তুই হয়ত প্রাণে বেঁচে যেতে পারিস: তখন আমার 'উৎসর্গগুলোর' ব্যাখ্যা দিতে পারবি। মানে কী জানিস, জীবন্ত লোকেদের প্রায় সর্বদাই নানা খুঁত থাকে। কিন্তু কল্পিত মূর্তি হতে পারে একেবারে নিখুঁত। যাকে বলে আদর্শ! তাকে ভালোবাসা সহজ। একেবারে স্বপ্নের মতো! অথচ সত্যিকারের লোকেদের কত খুঁত...'

'তাহলেও তারা তো জীবন্ত...'

'সেটা কি খুব বড়ো কথা?'

'কেনই বা নয়?'

অনুকম্পার দৃষ্টিতে মরকুটে চাইল আমার দিকে।

'একদিন হয়ত তুই বুঝবি, মানে যদি দৈবাৎ তুই... তখন আমার কবিতা নিয়ে আলোচনা লিখিস। কোনো প্রশ্ন যাতে না ওঠে। নইলে হয়ত 'অ. হ.', 'ই. ষ.' নিয়ে লোকে খোঁজাখুঁজি করবে, ভুল লোককে ধরবে...'

'শোন মরকুটে, অমন মুষড়ে থাকিস নে। তোর চেহারা দেখে অন্যেরাও ঘাবড়ে যাবে।'

মরকুটে 'শেষ হাসিটি' ফুটিয়ে তুলল মুখে।

'এই দ্যাখ, মরকুটের মেজাজ কেমন খাসা, আর তোর, প্রিন্স? কী রচনা করলি?'

স্যাঁতসেঁতে এই গুমো কুঠরিতে আহা,
আক্ষেপ নেই, একটুকু না, না!
দিনের আলো কী অপরূপ তাহা
এইখানেতেই হল মোদের জানা!
তুলনা করে তবেই বুঝি মূল্য,
আনন্দে তাই বুক আমাদের ফুলল!

দোষী দোষী ভাব করে দিনেমার প্রিন্স তার প্রকাণ্ড হাতদুটোকে সরিয়ে নিলে।

'এই আর কি... মাথায় খানিকটা খেলে গেল। হয়ত তোদের ভালো লাগবে?'

তার মধ্যে দৈহিক বলের সঙ্গে শিশুর লজ্জা মিশেই রয়ে গেল।

ভালো মানুষ প্রিন্স আমাদের আনন্দ দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার কবিতায় বিশেষ আনন্দলাভ কারো ঘটল না, কেননা ও ধরনের কবিতায় কেমন যেন আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। মনে হল জীবনে এই প্রথম সেটা টের পেল প্রিন্স, হাতদুটো পিঠের পেছনে সরিয়ে (হাতদুটো কী ভাবে রাখা যায় সেটা সে কখনোই বুঝে পেত না) আস্তে করে বললে:

'তাহলে মাপ করিস...'

'কী বলছিস? আমাদের সবাইকার মেজাজটা তুই চমৎকার প্রকাশ করেছিস!' সহানুভূতি না চেপেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

আমার সহানুভূতিটা কিন্তু প্রিন্সের ভালো লাগল না। হঠাৎ কবিতা ছিঁড়ে সে ছুড়ে দিলে অন্ধকারে। সেই অন্ধকারে, যার দৌলতে সে দিনের আলোর মূল্য বুঝেছে।

'কিন্তু এটা কি স্বাভাবিক নয়?' মরকুটে তার চিরাচরিত প্রশ্ন করল।

'কী?' ঠিক বুঝতে পারলাম না আমি।

'যা ঘটল আর কি। সেরা সাহিত্যিকেরা কি তাঁদের রচনা ছিঁড়ে ফেলেন নি? পুড়িয়ে দেন নি?'

'কিন্তু তার পেছনে সর্বদাই কারণ থাকত,' আপত্তি করলাম আমি. 'হয়ত লোকে তার কদর

করে নি, বোঝে নি... কিন্তু প্রিন্সের কবিতা তো আমরা সর্বদাই বুঝতে পারি। যাক গে, চক্রের অধিবেশন শেষ হয় নি কিন্তু!'

মিরোনভা হাত তুলে বললে:

'আমি শোনাতে পারি?'

'নিশ্চয়! কী তুই লিখেছিস মিরোনভা? স্কেচ?'

মিরোনভার স্কেচগুলো সর্বদাই শুরু হত 'আমার' শব্দটা দিয়ে। 'আমার সকাল,' 'আমার দিন', 'আমার বোন', 'আমার ঘর'... এ স্কেচটার নাম 'আমার রবিবার'।

'সাধারণত রবিবার দিন আমি স্থানীয় সময় অনুসারে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে উঠি এবং ১০টার সময় রেডিওতে 'পাইওনিয়র প্রত্যূষ' অনুষ্ঠানটা শুনি। এ রবিবার কিন্তু অ্যালার্ম ঘড়িটা বাজল অন্যান্য দিনের মতোই, অর্থাৎ ঠিক ৭টা ১০ মিনিটে। খুব তাড়াতাড়ি মুখ ধুলাম আমি, বাথরুমটায় তখনো কেউ আসে নি, সবাই তখনো ঘুমুচ্ছিল, কাজে যাবার তাড়া নেই। স্থানীয় সময় অনুসারে ৭টা ৩০ মিনিটে আমি সসেজ আর ডিম দেওয়া একটা স্যান্ডউইচ খেলাম..'

'তার শেষ প্রাতরাশ!' মনে মনে ভাবলাম আমি।

মিরোনভা পড়ে গেল:

'৮টা ৩০ মিনিটে আমি হাজির হলাম স্কুলের দপ্তরে। সাহিত্য চক্রের সমস্ত সভ্য সেখানে জুটল পুরনো বাগান বাড়িতে যাবার জন্যে। আমাদের চক্র যে সাহিত্যিকের নামে, তিনি সেখানে সাহিত্য রচনা করতেন। বাপের দিক থেকে সাহিত্যিকের নাতি গ্লেব বরোদায়েভ আমাদের জানাল যে, আমাদের ক্লাসের দিদিমণি নিনেল ফিয়োদরোভনা অসুস্থ। আগের দিন, অর্থাৎ শনিবার তিনি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে আসেন এবং ঠাণ্ডা লাগে...'

'শেষ লাইনটা আবার পড়!' জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, কেননা নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে সেই মুহূর্তে একটা অনুমান আমার মাথায় খেলে গেল।

ফের লাইনটা পড়লে মিরোনভা।

'কী ব্যাপার?' মরকুটে আমার হাত চেপে ধরল।

'দাঁড়া, দাঁড়া! মনে হচ্ছে পেয়েছি...'

'পেয়েছিস?!' উৎসাহে জিজ্ঞেস করল দিনেমার প্রিন্স।

'একটু সময় দে! মনে হয় যেন সূত্রটা ধরেছি... এবার ধরে এগুতে পারলেই হল!'

'বুঝিয়ে বলা কি তোর পক্ষে এতই কঠিন?' ঘ্যান ঘ্যান করে উঠল মরকুটে।

'একটু সবুর করা কি তোর পক্ষে এতই কঠিন?' ঠিক ওর অনুকরণ করে জবাব দিলাম প্রশ্ন দিয়ে, 'পড়ে যা মিরোনভা, পড়ে যা!..'

কী ভাবে আমরা ট্রেনে বসলাম, কী ভাবে নামলাম, বাগান বাড়িতে পৌঁছলাম, ভাইপোর সঙ্গে কী ভাবে আলাপ হল এবং 'স্থানীয় সময় অনুসারে ১১টা ৪০ মিনিটে' কী ভাবে দরজা বন্ধ হয়ে গেল — নিখুঁতভাবে সব আমাদের জানাল মিরোনভা।

'তা খ্ঁটিনাটি বর্ণনা আছে অনেক!' তারিফ করলাম আমি।

ওর আশ্চর্য প্রশান্তির জন্যে আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ (হ্কুম হয়েছিল, কেউ অস্থির হবে না, বাস, ও-ও আর অস্থির হয় নি)। তবে প্রধানত ওই লাইনটার জন্যে কৃতজ্ঞ, যেটা আমায় ধরিয়ে দিয়েছে... তবে আগে বেড়ে বলতে যাব না, যদিও ইচ্ছে হচ্ছে খ্বই।

'চক্রের অধিবেশন এখনো শেষ হয় নি!' ঘোষণা করলাম আমি।

'আমাদের বরং চুপ করে থাকাই কি ভালো নয়?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে, 'আমার মনে হচ্ছে, তোর মাথাটা খেলতে শ্রু করেছে। আমরা বরং চুপ করে থাকি, তোর ভাবনায় ব্যাঘাত হবে না...'

'সত্যি আলিক, সেই বরং ভালো!' বললে নাতাশা।

তার মানে, ও আমার ওপর এখনো ভরসা করে আছে! ফের গা হিম হয়ে এল আমার, তবে এটা আনন্দে। 'এবার এই যে স্ত্রটা আমি পেয়ে গেছি, তা ধরে এগ্তে হবে!' স্থির করলাম আমি।

'আরে না, আমার ভাবনা গ্লিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই! এই সব খ্ঁটিনাটির বর্ণনায় তা বরং জোরালোই হচ্ছে... এবার গ্লেব তার দাদ্র জীবনের কোনো একটা ঘটনা বল্ক। আগে যেমন সে বলত...'

'এই তো এইখানে, মানে দাদ্ আর কি... 'প্রনো বাগান বাড়ির রহস্য'...' এলোমেলোভাবে শ্রু করল গ্লেব, কিন্তু ফের কথা তার প্রো শেষ হচ্ছিল না, 'এই তলকুঠরিতে... ওইখানে, ওই টেবিলটায়...'

বেতে বোনা পায়া থেকে টেবিলটার গোলাকার পাটাটা সে খ্লল। তার ওপিঠে, কালো ফ্রেমের মধ্যে কী যেন লেখা ছিল। গ্লেব পড়ে শোনাল: 'এইখানে এক বছর, তিন মাস, সাত দিনে লিখিত হয় 'প্রনো বাগান বাড়ির রহস্য'।'

'স্মারক পাটা,' বললে মরকুটে।

'বটে, বটে, বটে...' চিন্তিতভাবে মন্তব্য করলাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গেই সবাই চুপ করে গেল।

নাতাশা কুলাগিনা দাঁড়িয়েছিল আমার পেছনে। আশার দ্ষ্টিতে সে চাইল আমার দিকে। আমি আমার অন্তর আর মাথার রগ দিয়ে সে দ্ষ্টি টের পাচ্ছিলাম। আমায় তা যেন প্ড়িয়ে দিচ্ছিল।

'তার মানে এখানে, এই তলকুঠরিতে তোর দাদ্ প্রেরণা পেতেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি গ্লেবকে, 'তাড়াহ্ড়ো করিস নে। ভালো করে ভেবে বল...'

'হ্যাঁ... প্রেরণা পেতেন।'

'নিজেকে ভয় পাওয়াতেন তিনি? গ্রিগোরি ভাইপো যা বলল? ভালো করে ভাব, তাড়া নেই।'

'হ্যাঁ... ভয় পাওয়াতেন।'

'সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে!' হ্কুম দিলাম আমি।

এবং নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম অন্ধকারের মধ্যে।

৮ম পরিচ্ছেদ

যাতে শেষ পর্যন্ত আমি... তবে সেটা নিজেরাই দেখতে পাবে!

সজোরে জড়িয়ে ধরলাম কঙ্কালটাকে। এবং জমাট, সূচীভেদ্য অন্ধকার থেকে তাকে টেনে আনলাম বাতির ক্ষীণ অনিশ্চিত আলোয়।

আনাটা সহজ হয় নি। কেননা লম্বা পথও কখনো মনে হয় অল্প আর সহজ, আবার ছোট্ট পথটাকেও কখনো লাগে দীর্ঘ আর দুস্তর। সবই নির্ভর করে হাতের বোঝাটার ওপর। মাথায় যদি ফুরফুরে ফুর্তির ভাবনা ছাড়া আর কিছু না থাকে, তাহলে খুবই সহজ, আর হাতে যদি থাকে কঙ্কাল...

ওহ্, কত অপ্রত্যাশিত গভীর ভাবনাই না সেদিন আমার মাথায় খেলেছিল! তার কোনোটা এমন কি নাতাশা কুলাগিনার খাতাটাতেও স্থান পাওয়ার যোগ্য বলে আমার ধারণা। 'ওর সাধারণ নোট খাতাটা হয়ত সত্যি করেই সাধারণ হয়ে উঠবে একদিন, (ওর আর আমার),' কল্পনা করলাম আমি। 'পালা করে আমরা তাতে আমাদের গভীর সব চিন্তা টুকে রাখব। তারপর পড়ব... শুনিয়ে-শুনিয়ে নয়, প্রত্যেকে নিজের মনে মনে, দুজন দুজনের সব কথাই জেনে নেব। সব কথা যে জানতেই হবে এমন অবশ্য নয়, কিন্তু সবচেয়ে জরুরী চিন্তা, যা কিনা... যা, কী নিয়ে? 'প্রাণের গতি' নিয়ে। কথাটা আমি একটা বইয়ে পড়েছি দিন কতক আগে। ভারি ভালো লেগেছে কথাটা: 'প্রাণের গতি'! দেখা যাচ্ছে প্রাণের তাহলে গতি আছে। আগে কখনো ভাবতেই পারি নি।

'ওহ্, নাতাশার প্রাণটা কোন দিকে গতি নিয়েছে তা যদি জানতে পারতাম, তাহলে আমার প্রাণটাও ঠিক সেই দিকে ফেরাতাম। তাহলে ধাক্কা লাগত আমাদের প্রাণে প্রাণে... বোধ হয় বলা ভালো, দেখা হত। কিংবা ছুঁয়ে যেত!' কঙ্কালটা চেপে ধরে এই সবই ভাবছিলাম আমি।

আর কীসে যেন খোঁচা লাগছিল আমার হাতে। ঠিক কীসে, সেটা অন্ধকারে ধরতে পারলাম না।

ভাবছিলাম, 'এক সময় এটা ছিল মানুষ! সুট পরে ঘুরে বেড়াত, ভাবত, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পালাত, পরীক্ষা দিত... হয়ত প্রেমেও পড়েছিল। আমার মতো! সত্যিই কি কখনো একদিন...'

হঠাৎ বড়ো সড়ো অন্ধকার একটা মূর্তি যেন দেখা দিল সামনে। মাথা নুইয়ে পাঁজরগুলোর মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম জিনিসটার দিকে, ছিটে বেড়ার ফাঁক দিয়ে লোকে যেভাবে দেখে।

'কে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি এমন গলায় যা প্রায় শোনাই যায় না। জিব আমার দখলে ছিল না।

জবাব দিলে দিনেমার প্রিন্স।

'আলিক তুই? যাক, বাঁচা গেল। ভয় হয়েছিল হয়ত হারিয়ে যাবি। যতই হোক তুই তো একলা...'

'একলা নই, কঙ্কাল সমেত দু'জন!' ওর সদাশয় কণ্ঠস্বরে আমার বাকশক্তি ফিরে এল, 'কী একটা খোঁচাচ্ছে এখানে... একটু হাত লাগা তো! তবে সাবধান, পাঁজরা ভাঙিস না।'

মিনিট খানেক পরেই নাতাশা কুল্যাগিনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। মানে ওর দিকে অবশ্য চাই নি, ভাব করলাম যেন সবার জন্যেই বুঝিয়ে বলছি:

'বাগান বাড়ির বাসিন্দের কঙ্কাল এটা নয়! যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ করে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে কঙ্কালটা, তলকুঠরিটা এবং সাধারণভাবে এই গোটা ডেরাটাই গ্র. বরোদায়েভ ব্যবহার করতেন অনুপ্রেরণা পাবার জন্যে। প্রথমে উনি নিজেকে ভয় পাওয়াতেন, তারপর পাঠকদের। সুতরাং, আমাদের যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেটা... এই অবস্থায় পেঁছবার জন্যে নয়!'

কঙ্কালটার দিকে দেখালাম আমি।

'এত ভরসা তোর কোত্থেকে?'

অভিজ্ঞ চোখ প্রায় নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে যে মরকুটে ভয়ানক ভয় পাচ্ছিল মরতে। কিন্তু না, আমাকে হেয় করার জন্যে ও প্রশ্নটা করে নি। ও শুধু চাইছিল যেন আমি ওর দুশ্চিন্তা কাটাই। কেউ যখন তোর ওপর ভরসা করে, তোর কাছ থেকেই আশ্রয় এবং সান্ত্বনা চায়, তখন সেটা ভারি প্রীতিকর। তবে কঠিনও!

কত অপ্রত্যাশিত পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত সেদিন আমায় করতে হয়েছিল এই তলকুঠরিতে!

'এটা যে সেই বাসিন্দে নয়, এ বিশ্বাস তোর হল কোত্থেকে?' ফের জিজ্ঞেস করল মরকুটে এবং আমার উত্তরের জন্যে উৎসুক হয়ে রইল সবাই।

'কোত্থেকে হল? প্রথমত, যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ। এবং দ্বিতীয়ত...'

এই সময় আমার চোখে পড়ল অন্ধকারে তখন হাতে খোঁচা লাগছিল কীসে।

'দ্যাখ, দ্যাখ সবাই! দেখছিস? এই দ্যাখ, নম্বর দেওয়া মার্কা! আবার একটা লোহার পাত। কী যেন লেখা রয়েছে দেখছি...'

পাতটা চোখের কাছে এনে পড়ে শোনালাম:

'**প্রিয় লেখকের ভাষণের জন্যে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ উপহার। তত্ত্বাবধানাধীন স্কুলের জীববিদ্যা ল্যাবরেটরির থেকে**... এটা হল উপহার!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'স্কুলটা দেখাশোনা করতেন তিনি, ভাষণ দিতেন। তাই উপহার দিয়েছে তাঁকে। হয়ত দুটো কঙ্কাল ছিল ল্যাবরেটরিতে... একটি উপহার দিয়েছে! তাছাড়া, অনুপ্রেরণার জন্যে ওটা যে তাঁর দরকার। এবার বিশ্বাস হল তো? বাগান বাড়ির বাসিন্দে তো আর নিজের কঙ্কালের ওপর মার্কা, নম্বর আর পাত নিয়ে ঘুরত না। তাতে আবার ওই তারগুলো, যা দিয়ে জড়ানো!'

সবাই কৃতজ্ঞের দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। অন্তত তাই আমার মনে হল। হয়ত বা একেবারে পুজোর দৃষ্টিতেই। আধা অন্ধকারে সঠিক ঠাহর করা মুশকিল।

আমিও খুশি হয়ে উঠলাম শিশুর মতো!

কিছু আগেও ভাবছিলাম 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য' ভেদ করছি, আর এখন রহস্য ভেদ করা হল না বলেই আনন্দ হল, ভুল ভাবছিলাম, কঙ্কালটা মোটেই বাগান বাড়ির বাসিন্দের নয়, স্কুলের জীববিদ্যা ল্যাবরেটরির।

জীবনে কত ব্যরবারই না আমাদের পরিকল্পনা আর প্রতিক্রিয়া উল্টো হয়ে দাঁড়ায়!

'একেই বলে প্রতিভা!' উচ্ছ্বসিত হয়ে মৃদুস্বরে বললে দিনেমার প্রিন্স, 'এ হল জন্মসূত্রে পাওয়া!'

অপরের প্রতিভার ভক্ত সে।

'আর আমি...' প্রিন্স তার লম্বা হাতদুটো এমনভাবে বাড়িয়ে দিলে যেন বলতে চাইছে: হাতদুটো এত লম্বা হওয়া সত্ত্বেও আজ কোনো কাজ দিলে না।

'ভাবনা নেই, ভাবনা নেই... এখনো সময় যায় নি!' পায়ের ডগায় উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় চাপড়ে দিলাম দিনেমার প্রিন্সের।

'কিন্তু ধরলি কী করে, মার্কা নম্বর আর পাতটা দেখার আগেই?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে।

'গ্লেব যখন টেবিলটা ওলটায়...'

আমিও টেবিলটার কাছে গিয়ে ওটাকে উল্টে দিয়েছিলাম। কথাটা আমি শেষ করলাম না, কেননা উল্টো পিঠটায় চোখ পড়েছিল... কাউকে কিছু বলি নি, তবে বুঝেছিলাম, আরো একটা জরুরী তথ্য যোগ হল। অত্যন্ত জরুরী! রহস্যভেদের কাছে এসে গেছি।

'আমাদের কাছ থেকে চেপে রাখিস না কিন্তু,' চাঙ্গা গলায় মিনতি করলে মরকুটে, 'মিরোনভার স্কেচের ও লাইনটায় তুই অমন লাফিয়ে উঠলি যে? ওতে তো কিছুই নেই। মনে আছে, তখন তুই বলেছিলি যে সূত্র পেয়ে গেছিস? অথচ লাইনটায় সূত্রের মতো কিছুই নেই!'

'যে যা বোঝে!' বললাম আমি, 'কখনো কখনো অর্থহীন একটা তথ্যই হয়ে দাঁড়ায় তদন্তের পক্ষে অতি অর্থময়! আবার বাইরের দিক থেকে অর্থময় তথ্যের কোনো অর্থই হয় না।'

হাত তুললে মিরোনভা।

'আমি কিছু বলতে চাই!'

'বেশ, বল!'

'আমি ও লাইনটায় দাগ দিয়ে রেখেছি।'

'হ্যাঁ, তোর লাইনটাই আমাদের পথ দেখিয়েছে...'

'কীসের পথ?!' সগর্বে ফিস ফিস করলে সে।

জবাব দিলাম, 'উদ্ধারের পথ!'

সবারই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল... কিন্তু আর কিছু ভাঙলাম না আমি।

বললাম, 'একটু সময় দে আমায়। তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। পরিস্থিতি বুঝতে হবে তলিয়ে! ভাবতে হবে, ওজন করে দেখতে হবে... এবং সিদ্ধান্ত টানতে হবে!'

সবাই চুপ করে বসলে বাক্সগুলোর ওপর। সবাই আমায় মেনে নিয়েছে, আমারই ভরসা করছে। বরাবরই ইচ্ছে হত, আমার কোনো একটা কৃতিত্বের সময় নাতাশা কাছে থাকুক, দেখুক। কিন্তু এমন একটা মুহূর্তের কথা আমি কল্পনাও করি নি। এমন কি স্বপ্নেও দেখি নি!

সত্যি, 'দুর্ভাগ্যের দৌলতে সৌভাগ্য' এ প্রবাদটা কী সঠিক! তলকুঠরির অন্ধকারেই কেবল আমার যত গুণ অমন জ্বলে উঠতে পারল। সাধারণভাবেই আলোর চমক তখনই বেশি, যখন তা হঠাৎ জ্বলে ওঠে অন্ধকারে। এ ভাবনাটা নাতাশার খাতায় টুকে রাখা উচিত!

'একটু সময় দে আমায়,' ফের বললাম আমি।

'কিন্তু সময় যে আর নেই,' বললে নাতাশা।

'কোন দিক থেকে?'

'ট্রেন ছাড়তে বাকি মাত্র দেড় ঘণ্টা!'

'ত্বরান্বিত পদ্ধতিতে কাজ চালাব আমি। তদন্ত শুরু হচ্ছে! আমাদের একটু নিরিবিলি থাকতে হবে!..'

হাত তুললে মিরোনভা:

''আমাদের' মানে কে কে?'

'আমি আর আমার চিন্তা, তথ্য।'

অন্যান্য বাক্সগুলো থেকে দূরে একটা বাক্সে বসে চিন্তায় ডুবে গেলাম।

আমি জানতাম যে সত্যিকারের গোয়েন্দাদের একজন করে সহকারী থাকা উচিত, সে সহকর্মী হবে খুবই ভালো এবং সরল লোক, বোকার মতো নানা রকম কথা কইবে সে, আর তার সঙ্গে তর্ক করতে করতে গোয়েন্দা ঠিক আসল অপরাধীর হদিশ পেয়ে যাবে। আমি অবিশ্যি কারো নকল করতে চাই না, তাহলেও ইচ্ছে হচ্ছিল নাতাশা হোক আমার সহকারী, দেখুক কেমন যুক্তি নিয়ে আমি চিন্তা করি। তবে ওকে দিয়ে বোকার মতো কথা বলাতে আমি পারব না। তাছাড়া, আমি যদি চাই-ও, তাহলেও বোকার মতো কথা কি আর ওর মুখ দিয়ে বেরবে!

তাই একা একাই বিশ্লেষণ শুরু করলাম আমি...

আমি জানতাম যে, নামকরা গোয়েন্দারা অপরাধের তদন্ত করতে গিয়ে প্রথমে স্থির করে: অপরাধটায় লাভ কার?

'হুঁ, হুঁ, হুঁ... আমি ধরব উল্টো পথ! নিজের পদ্ধতিতে চলব,' ঠিক করলাম আমি, 'উল্টো দিক থেকে এগুব, জ্যামিতির উপপাদ্য যেভাবে মাঝে মাঝে প্রমাণ করা হয়। হ্যাঁ, তাই করা যাক: স্থির করা যাক তলকুঠরিতে আমাদের বন্ধ রাখায় কার লাভ নেই।

'অবশ্যই, আমাদের কারুরই লাভ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাভ নেই কার? নাতাশার! মায়ের ওর ভারি অসুখ। ঠিক পাঁচটার ট্রেনে তাকে চাপতেই হবে! তাহলে এই গেল... এবার দেখা যাক: নাতাশার লাভ না থাকায় কার লাভ বেশি। পরের পদ্ধতিতে চলে যাচ্ছি... কিন্তু কী করা যায়! নাতাশার ওপর প্রতিহিংসা নিতে পারে কে? এবং কেন? খতিয়ে দেখা যাক! নিশ্চয় কাউকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেও ঠিক করল... প্রায়ই তো লোককে অপরাধের পথে ঠেলে দেয় প্রেম! সে তো নাটকেও দেখা যায়, ফিল্মেও দেখা যায়... কিন্তু কে প্রতিহিংসা নিচ্ছে? গ্রিগোরি ভাইপো? তার পক্ষে শুধু প্রতিহিংসার হাতিয়ার হওয়াই সম্ভব! এই তাহলে ব্যাপার... এতে কোনো সন্দেহ নেই। ওকে মানাচ্ছে না: বয়সেও বটে, সাধারণভাবে সব দিক থেকেই... একটা গভীর হৃদয়াবেগ কি আর ওর পক্ষে সম্ভব? কিন্তু কে ওকে তার হাতিয়ার করেছে? কে?! মরকুটে? কিন্তু ও ভালোবাসে কল্পিত মূর্তি। এবং মোটের ওপর ভয়ে মরছে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার আগে সন্দেহ করতে হবে সবকিছুই। হয়ত মরকুটে কেবল ভান করছে? হয়ত

আসলে ওর কোনো ভয়ই হচ্ছে না? না, তা হতে পারে না! ওর দিকে একবার তাকালেই তা বোঝা যায়... দিনেমার প্রিন্স? না। ও উদার লোক। তার মধ্যে দৈহিক বলের সঙ্গে মিলেছে শিশুর মতো সঙ্কোচ। কিন্তু সবাইকেই সন্দেহ করে দেখতে হবে আমায়! হয়ত ও স্রেফ উদারতার ভান করছে?

'সবাইকেই সন্দেহ করতে বসা অবিশ্যি ভারি বিছছিরি ব্যাপার! তাহলেও... একেবারে আদ্যোপান্ত খতিয়ে দেখতে হবে আমায়। বটে, বটে, বটে... মানে, সবাইকে সন্দেহ করতে হবে কেবল নাতাশা ছাড়া... হয়ত মিরোনভা? ধরা যাক, নাতাশাকে সে হিংসে করে? উঁহু, হতে পারে না। ববরাদ! হিংসে সে করতে পারে কেবল তাকে, মাস্টাররা যাকে তার চেয়ে বেশি কদর করে। আর তার চেয়ে বেশি কদর মাস্টাররা কাউকে করে না! অর্থাৎ নেতি-নেতি পদ্ধতি, বাদ দিয়ে দিয়ে পেঁছিনো, তদন্তে মাঝে মাঝে যা প্রয়োগ করা হয়... পুরনো পদ্ধতিই নেওয়া যাক। কথায় বলে 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে'। হয়ত কথাটা কেবল চালের ক্ষেত্রেই খাটে এমন নয়। ওহ, প্রবাদ কথাগুলো কী মোক্ষম!

'এইভাবে পেঁছিলাম গ্লেব পর্যন্ত... ফের সে প্রত্যেক কথাতেই আটকে যাচ্ছে। আর চুপ করে থাকছে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কথাটা শুধু তাই নয়। ওর ওপর যে আমার সন্দেহ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি, সেটা কেবল এই কারণেই নয়। হুঁ, হুঁ, হুঁ... কিন্তু কী কারণে? প্রথমত আমাদের মধ্যে কেবল সেই ভাইপোকে জানত আগে থেকে। এই হল এক নম্বর সূত্র! এবং দ্বিতীয়ত ও তৃতীয়ত... আমার পর্যবেক্ষণ, যার কথা কেউ জানে না! আমার ওই দুটি অনুমান... ওর মধ্যেই চাবিকাঠি! আমি একেবারে নিশ্চিত... কিন্তু সবকিছুই সন্দেহ করে দেখতে হবে আমায়! আচ্ছা!.. সবকিছু প্রমাণ করে দিতে হবে! প্রমাণ!'

ফিরে তাকালাম আমি। সবাই চুপচাপ বসে আছে বাক্সগুলোর ওপর। অপেক্ষা করছে... আর ঢুলছে মিরোনভা। চরিত্রটা ওর লোহার মতো! সকলের ওপর চোখ বুলিয়ে আমি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম গ্লেবের ওপর।

'এবার জেরা করতে হয়! জেরাটা চালাব দূর থেকে, যাতে সন্দেহভাজনটির কোনো সন্দেহ না হয়। আগেই সাবধান হওয়া দরকার। সবচেয়ে বড়ো কথা আইন মেনে চলতে হবে! আইনের বাইরে যাওয়া চলবে না। এই নিয়ে খবরের কাগজে আজকাল প্রায়ই লিখছে। আমিও বেআইনী কিছু করব না। প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সবকিছুই সন্দেহ করে যেতে হবে... এবং জুলুম করে কবুলতি আদায় চলবে না! কোনো রকম মারধোর নয়! হুঁ, হুঁ, হুঁ...'

'গ্লেব, তোর যদি ইচ্ছে হয়, আমার কাছে একটু আসবি? যদি ইচ্ছে না হয় আসিস না। আমি তোকে জোর করে কিছু করাব, তা নয়। আমি নিজেই যেতে পারি তোর কাছে। তবে তোর যদি ইচ্ছে হয়...'

'কী যে বলিস...' চট করেই সাড়া দিলে গ্লেব, 'আমি নিশ্চয়ই...'

কথাটা ও শেষ করল না। কিন্তু ওটা কোনো সূত্র নয়; আগেও সে কথা শেষ করত না। হ্যাঁ, আগেও এটা ছিল তার এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য।

তবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি টের পেলাম যে ও সাড়া দিলে যেন একটু বেশি চট করে। যেন অপেক্ষাই করছিল যে তার ডাক পড়বে। এবং একটু বেশি চট করেই ছুটে এল আমার কাছে, যেন ভয় পাচ্ছিল আমি জোরে কিছু একটা শুধাব আর সবাই তা শুনে ফেলবে।

'এ্যাঁ? কী?..' বললে সে ফিস ফিস করে, যেন বলতে চায় এমনভাবে আমাদের আলাপ হোক যাতে আর কারো কানে না যায়।

আমার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, যেন সদ্য সদ্য তাতে শাণ পড়েছে।

'জানতে চাস কঙ্কালটার রহস্যভেদ করলাম কীভাবে? খুব সোজা। তুই যখন টেবিলের পাটা উলটে পড়ে শোনালি যে উপন্যাসটা আদ্যোপান্ত এইখানেই লেখা, অমনি আন্দাজ করতে অসুবিধা হল না যে তোর দাদুর অনুপ্রেরণার জন্যে শুধু তলকুঠরি নয়, কঙ্কালটারও দরকার ছিল! নিজেকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে... অনুমানটা প্রমাণের জন্যে আমি ছুটে গেলাম অন্ধকারে। মার্কা নম্বর আর পাতটায় তা প্রমাণ হল। কিন্তু তাই সব নয়...'

'তাহলে কী?'

'গ্লেব, তোর যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে টেবিলটা উল্টে আরেকবার একটু পড়ে শোনা না, কী লেখা আছে ওতে?' বললাম আমি একটু অতিরিক্ত সৌজন্য দেখিয়ে।

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল নাতাশা দেখুক কেমন বুদ্ধিমানের মতো সূক্ষ্ম চালে আমি কাজ চালাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে কী ভাবে শাণিত হয়ে উঠছে আমার পর্যবেক্ষণশক্তি। কিন্তু আমাদের আলাপটা কেবল নাতাশার কানেই যাবে, আর কেউ শুনবে না, সেটা করা অসম্ভব। আর বাকি সবাই যদি শোনে, তাহলে সময় হবার আগেই তারা গ্লেবকে সন্দেহ করে বসবে। 'আর যদি সে নির্দোষ হয়?' ভেবে দেখলাম আমি, 'যদি আমার অনুমানটা হয় নিতান্ত অনুমানমাত্র? উঁহুঃ, আইনের বাইরে যাওয়া চলবে না!' এই ভেবে তদন্ত চালাতে লাগলাম ফিস ফিস করে।

'ওখানে, সকলের সামনে টেবিলটা ওলটাবার দরকার নেই। যদি তোর অসুবিধা না হয়, টেবিলটা এখানে নিয়ে আয়। এইখানে উলটিয়ে আস্তে করে আমায় পড়ে শোনা। কেমন যেন আমার চোখ কড় কড় করছে। হয়ত চারপাশের অন্ধকারের চাপে। আমায় একটু সাহায্য কর গ্লেব, যদি প্যারিস।'

'আমি নিশ্চয়... অসুবিধা হবে না...'

টেবিলটা সে টেনে আনল বাক্সের কাছে, যার ওপর বসে আমি ঘটনা বিশ্লেষণ করছিলাম। তারপর উল্টে পড়ে গেল:

'এইখানে এক বছর, তিন মাস, সাত দিনে লিখিত হয় 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য'।'

'বটে, বটে, বটে...' মনে মনে ভাবলাম আমি, 'পড়ল ও ঠিক প্রথম বারের মতোই। তার মানে ব্যাপারটা দৈবাৎ নয়।'

'আচ্ছা গ্লেব, একটা শব্দ তুই বাদ দিলি কেন, বল তো?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'তোর যদি অসুবিধা না হয়, তাহলে একটু বুঝিয়ে বল না। তাড়াহুড়া করিস না, ভালো করে ভেবে দ্যাখ।'

'আমি?.. শব্দ?.. কী শব্দ?'

'কেবল একটি শব্দ, কিন্তু খুব জরুরী!'

'স্মারক পাটাটা' হাতে নিলাম আমি।

'লেখা আছে এই:

এইখানে এক বছর, তিন মাস, সাত দিনে কল্পিত ও লিখিত হয় 'পুরনো বাগান বাড়ির রহস্য' উপন্যাস। আর 'কল্পিত' শব্দটা তুই বাদ দিলি। কেন? গুছিয়ে ভেবে দ্যাখ... তাড়াতাড়ি নেই।'

'লক্ষ করি নি... খেয়াল হয় নি...'

'দুই বারই? ওই একই শব্দটা? খুবই তাজ্জব বলতে হয়, তাই না?'

'খেয়াল করি নি...'

'দুই বারই?'

'দুই বার...'

'পর পর তিন বার নয়ত?'

'না... কেবল দুই বার...'

'মাপ কর বাছা, স্মৃতি তোকে ঠকিয়েছে। প্রথম বার শব্দটা তুই খেয়াল করিস নি ওখানে, ওই শহরেই। যখন তুই আমায় বলেছিলি যে ব্যাপারটা সত্য ঘটনা, বাগান বাড়ির বাসিন্দের সমস্ত কাহিনীটা। অথচ দেখা যাচ্ছে যে গ্ল. বয়োদায়েভ ওটা কল্পনা করেছিলেন। তাহলে আমায় তুই যে বললি বাসিন্দে সত্যিসত্যিই এখানে থাকত, নববর্ষের রাতে নিখোঁজ হয়? তোর দাদুর কল্পিত চরিত্রটা নয়, সত্যিকারের, যাকে বলা যায় জ্যান্ত একটা মানুষ? ধাঁ করে উধাও হয়ে গেল... কেন তুই এটা বললি? ভাইপোকে দিয়েও তাই বলিয়েছিস? ভালো করে ভেবে দ্যাখ, তাড়াহুড়া করিস না।'

মোটেই তাড়াহুড়ো করলে না গ্লেব। মুখ বুজে বসে রইল।

'বটে, বটে, বটে...' বললাম আমি শাসানি না চেপেই।

'বেশ... আমি তোকে... সব সত্যি...'

'হ্যাঁ, সত্য, শুধু সত্য! সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়!'

'তা নইলে তুই এখানে... তোর অতটা ইচ্ছে... অন্যেরাও এল...'

'কয়েকটা খতিয়ান টানা যাক,' বললাম আমি, 'তার মানে, তোর খুব ইচ্ছে হয়েছিল যে আমরা সবাই এখানে আসি। আমাদের আগ্রহ জাগাবার জন্যে তুই বললি যে ঘটনাগুলো সব সত্যিই ঘটেছিল, দাদুর কল্পনা নয়।'

'মানে হ্যাঁ...'

'কিন্তু আমাদের সবাইকে আনার জন্যে তোর এত ইচ্ছে হল কেন?'

এই সময় এসে দাঁড়াল নাতাশা। আস্তে করে বললে:

'আলিক, সময় আর বেশি নেই।'

'ভাবনা নেই, ধরে নে যে মায়ের কাছে যেতে শুরু করেছিস!' সোল্লাসে বলে উঠলাম আমি, 'শীগগিরই তোর মা তোকে চুমু দেবে...'

আমার কথাটা মরকুটের কানে গেল। হয়ত আশায়, হয়ত বা সন্দেহে সে বলে উঠল:

''চূর্ণ হবে অন্ধকার, মুক্তি দেখা দেবে দ্বারদেশে...''

তার মানে ভয়ে তার স্মৃতিশক্তি এখনো গুলিয়ে যায় নি: পুশকিনের কবিতার ছত্রটা তার মনে আছে দেখছি, যদিও একেবারে হুবহু নয়...

'হ্যাঁ, দেখা দেবে!' জোর দিয়ে বললাম আমি, 'আর কয়েকটা মিনিট, তোদের বার করে আনব এখান থেকে...'

'মন্ত্রের জোরে?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে।

তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তিতে আমি টের পেলাম যে ওর সন্দেহ ঘোচে নি। ইচ্ছে হল তাড়াতাড়ি আমার আবিষ্কারগুলো দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিই।

'মিরোনভার স্কেচের সেই লাইনটার কথা মনে আছে তোর?' জিজ্ঞেস করলাম গ্লেবকে।

'কোন লাইন?..'

'এমনিতে, লাইনটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু কথাটায় আমার কয়েকটা জিনিস মনে পড়ে গেল, একটা যেন আলো দেখলাম। লাইনটা আমার একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। নিনেলকে নিয়ে লেখা: 'আগের দিন, অর্থাৎ শনিবার তিনি নতুন বাড়িতে উঠে আসেন ও ঠান্ডা লেগে যায়...' তার মানে নিনেল উঠে গেছেন একেবারে আনকোরা নতুন বাড়িতে?'

'আমাকে স্কুলের দরোয়ান... তারপর উনি নিজে... টেলিফোনে...'

'কিন্তু আনকোরা নতুন বাড়িতে টেলিফোন থাকে কি? টেলিফোন বসান হয় পরে। তাহলে ফোন করলেন কোথা থেকে? ওঁকে বাদ দিয়েই আমাদের যাবার অনুমতি দিলেন? নাকি বলবি, ১০৩ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে তিনি পাবলিক টেলিফোনে ফোন করতে এসেছিলেন?'

'আমি তোদের সব... আমি এক্ষুণি...'

'সময় নেই! অপরাধের কৈফিয়ত যা দেবার, দিবি পরে। গ্লেবে! এখন আমার চোখের দিকে তাকা। সত্যি বলবি, শুধু সত্যি, সত্যি ছাড়া কিছু নয়। কোথায় এখান থেকে বেরুবার পথ? নয়ত হুকুম দে ভাইপোকে! তুই তো তাকে শিখিয়েছিস?'

'আমি এক্ষুণি... আমি তোদের... কিছু ভাবনা নেই...'

'সবকিছু বিশ্লেষণ করলাম আমি আর উদ্ধারকর্তা সাজবে ও?' দুশ্চিন্তাটা ঝলক দিয়ে গেল মাথায়।

গ্লেব ততক্ষণে অন্ধকারে ছুটতে যায় আর কি। কিন্তু নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের মতো একটা আন্দাজ মাথায় খেলে গেল। ঝট করে হাত বাড়িয়ে ওকে থামালাম।

'নাতাশা!' চিৎকার করলাম আমি, 'তোর আস্তিনটা দেখা তো!'

'তদন্তের জন্যে বস্তুগত প্রমাণ?' মড়ার মতো চেহারায় ব্যঙ্গ করলে মরকুটে। তখনো তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আমরা তলকুঠরি থেকে বেরুব।

নাতাশার আস্তিনটা ছুঁয়ে দেখলাম আমি। বুক আমার এমন ঢিপ ঢিপ করে উঠল যে সবারই কানে গেল তা, সবাই ফিরে তাকাল আমার দিকে। নাকি ওর আস্তিনে আমি কী পেলাম, তাই দেখতে চেয়েছিল ওরা? এ কথাটা আমার মাথায় খেলে পরে। তখন কিন্তু আমার মাথায় কোনো কথাই ছিল না। স্রেফ ওর হাতটা ধরে রইলাম আমার হাতে...

'আলিক, সময় নেই কিন্তু,' বললে নাতাশা।

তাড়াতাড়ি করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু ওর কথায় পৃথিবীতে ফিরে এলাম।

প্রতি মিনিটই এখন জরুরী! ট্রেন ধরতে হলে আর বেশি সময় নেই। একেবারেই নেই! আর নাতাশার পথ চেয়ে আছেন তার রুগ্না মা!..

ফের আমার চিন্তাযন্ত্র কাজ করতে শুরু করলে। 'রঙটা যখন নাতাশার আস্তিনে লেগে গেছে, তখন 'সাবধান! কাছে আসিবে না!' কথাগুলো লেখা হয়েছে নিশ্চয় আমাদের আসার কিছু আগে: রঙ এখনো শুকিয়ে ওঠার সময় পায় নি!.. হুঁ, হুঁ... মনে পড়ছে গ্লেব তখন চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'কাছে যেও না!..' তার মানে এক্ষুনি কাছে যাওয়াই দরকার!'

ছুটে গেলাম প্লাই উডের টুকরোর দিকে, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। মানে, বলা ভালো, ঠেলে সরালাম... ওটা দিয়ে ঢাকা ছিল দরজাটা। দরজা ঠেলতেই অনিচ্ছায় তা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল। বোঝা গেল, পুরনো, আড়ষ্ট দরজাটা বন্ধ হয় না। সেটা আমাদের সৌভাগ্য: ভাইপো ওটা বন্ধ করতে পারে নি। আমাদের মুক্তির পথ খুলে গেল ওখানে।

'এই দ্যাখ, তোদের বেরুবার পথ!' সোল্লাসে চিৎকার করে আমি চাইলাম নাতাশার দিকে।

জবাবে যে দৃষ্টিতে নাতাশা চাইলে আমার দিকে, তা কৃতজ্ঞতায় ভরা, হয়ত বা... নাকি সেটা মাত্র আমার মনে হয়েছিল?

মরকুটে ছুটতে গেল দরজার দিকে... অঙ্গুলির ঈষৎ সংকেতে ওকে থামালাম।

'প্রথমে যাবে মেয়েরা!'

'এবং শিশুরা,' অভ্যাসবশে প্রায় যোগ করতে যাচ্ছিলাম আর কি।

অল্প একটু আলো হয়ে উঠল তলকুঠরি। মনে হল যেন ওটা আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তিরই আলো।

কিন্তু কত অপ্রত্যাশিত প্রতিবন্ধকই না হাজির হয় জীবনে!

তলকুঠরি তার দৃঢ়, সিক্ত আলিঙ্গন থেকে আমাদের ছাড়তে চাইছিল না। মরচে ধরা লোহা বাঁধানো দরজাটা বন্ধ হয় না বটে, তবে খোলেও না। পাথুরে মেঝের ওপর ঝন ঝন করে খানিকটা এগিয়ে একেবারে অনড় হয়ে যেন গেঁথে গেল। দেয়াল এবং দরজার মধ্যে ফাঁকটা হল খুবই সঙ্কীর্ণ।

বললাম, 'গলে বেরতে হবে। প্রথমে যাবে মেয়েরা...'

ইঙ্গিত করলাম নাতাশার দিকে। কোনো উচ্চবাচ্য করলে না সে, কত সে ভালো তা দেখাবার জন্যে বললেও না যে আগে অন্যেরা যাক। না, লোক দেখাবার জন্যে কখনো সে কিছু করে না!

সুঠাম ছিপছিপে চেহারা ওর, গলতেও হল না, গুঁতোতেও হল না, যেন আপনা থেকেই মুক্ত হয়ে গিয়ে দাঁড়াল রাস্তায়। একটুও বিচলিত দেখাল না তাকে।

'এবার মিরোনভা!' বললাম আমি।

এ ব্যাপারেও ঠিক ক্লাসের পয়লা নম্বর ছাত্রীর মতোই ব্যবহার করলে সে: ভেবেচিন্তে, তাড়াহুড়া না করে প্রথমে সে ফাঁকটা কতটা চওড়া তা আঁচ করলে। তারপর চেয়ে দেখলে নিজের দেহটার দিকে। মনে মনে হিসাব করলে কী সব, তারপর হাত তুললে:

'ওভারকোটটা খুলতে পারি?'

ওভারকোট খুলে গলে বেরিয়ে গেল। এ ক্ষেত্রেও সে নিখুঁতভাবে হুকুম মেনে চলল: সযত্নে বাধা অতিক্রম করতে করতে সে দলপতি হিশেবে আমার কাছে রিপোর্ট দিয়ে চলল:

'পিঠের আধখানা কেবল বাকি... এখন ঘাড়টা কেবল বাকি!.. এবার হাতটা... এবার সব ঠিক: কিছুই আর বাকি নেই!'

ফাঁকটায় প্রথম আটকে গেল মরকুটে। দেখা গেল আমাদের মধ্যে ওই সবচেয়ে মোটা, বা ওর কথা অনুসারে 'সবচেয়ে পুরুষ্টু'।

বললাম, 'পেট ভরে কেবল গিলিস, তাতে আবার কিনা কবি!'

'আমার বিপাক ক্রিয়ায় গণ্ডোগোল আছে। এটা একধরনের রোগ!' বললে মরকুটে।

'তাহলে ওভারকোটটা খুলে ফেল।'

খুললে। কিন্তু ওভারকোট ছাড়াও আটকে গেল।

'দাঁড়া, আমি তোকে সাহায্য করছি,' বললে দিনেমার প্রিন্স। এবং সন্তর্পণে ঠেলতে লাগল মরকুটেকে।

'কী একটা মট করে উঠল!' চেঁচালে মরকুটে, 'মনে হচ্ছে গলে বেরুতে পারব না...'

'তাহলে দুয়োরটা ঠেলি, দাঁড়া,' বললে প্রিন্স।

মরচে পড়া ভেজা দরজাটায় কাঁধ লাগিয়ে সে চাপ দিলে। দরজাটা নড়ল বটে, তবে অতি সামান্য। প্রিন্সের মধ্যে শিশুর মতো লজ্জার সঙ্গে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি মিশে থাকলেও কিছুই সে করতে পারল না।

'কোট, শার্ট, প্যান্ট—সব খুলে ফেল!' হুকুম দিলাম আমি।

'তা কি হয় কখনো?' মিনমিনে গলায় বললে সে।

'তর্ক করার সময় নেই আমাদের!'

'হেমন্ত কালে কি কাপড় জামা ছাড়া যায়?'

এতই বিচলিত হয়ে উঠেছিল যে তার অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই, অর্থাৎ প্রশ্ন দিয়েই কথা কইতে লাগল সে।

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' বললে পরোপকারী প্রিন্স।

'বহাল তবিয়তে মরার চেয়ে বরং ঠাণ্ডা লেগে বাঁচাই ভালো!' বললাম আমি।

পোষাক ছাড়লে মরকুটে। মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ন্যাংটা মরকুটে (মানে প্রায় ন্যাংটা, শুধু জাঙিয়া ছিল পরনে) সরু ফাঁকটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'দৌড়োদৌড়ি করে একটু গরম হয়ে নে!' তলকুঠরি থেকে উপদেশ দিলে দিনেমার প্রিন্স।

মরকুটেও অমনি ছুটতে শুরু করলে।

'আরে, আগে পোষাক পরে নে, তারপর...' বললে পরোপকারী প্রিন্স।

ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করছিল মরকুটে, কিছুই ওর মাথায় ঢুকছিল না। নাতাশা আর মিরোনভা ওকে শার্ট, কোট, ওভারকোট পরিয়ে দিলে। প্যাণ্টটা অবশ্য সে পরলে নিজেই।

'এবার গ্লেব!' বললাম আমি।

'আমি পরে... আমার জন্যেই যখন...' আস্তে করে বললে গ্লেব, 'মানে, সবই তো এসব...'

'তদন্ত শেষ করা যাবে পরে,' ফিসফিসিয়ে থামালাম ওকে, যদিও আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল ওকে সোজাসোপটা জিজ্ঞেস করি: কেন তুই এসব করলি বল তো!—'এখন আলোচনার সময় নেই, কেননা সময়ের দাম আছে!'

গ্লেবও ওভারকোট খুলে বেরিয়ে গেল।

দিনেমার প্রিন্স ফাঁকটার দিকে দেখিয়ে বললে:

'এবার তুই যাবি আলিক!'

'আমি সবার পরে!' বললাম এমন ভাব করে যেন কোনো ডুবন্ত জাহাজের ক্যাপটেন: ক্যাপটেনরা সর্বদাই জাহাজ ছাড়ে সবার শেষে।

দিনেমার প্রিন্স বিব্রতের মতো প্রকাণ্ড হাত দুখানা এলিয়ে দিলে।

'আমাকেও দেখছি... মানে, মরকুটের মতোই...'

মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে রইল।

'তোরাও মুখ ঘোরা,' আমায়, গ্লেব, আর মরকুটেকে বললে প্রিন্স।

প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির সঙ্গে ওর শিশুর মতো লজ্জা তখনো টিকে ছিল।

প্রিন্স অবশ্য মুটকো ছিল না, কিন্তু তার বুক, হাত, এমনকি পেটের পেশীগুলোও এমন তাগড়াই যে আটকে যেতে পারত। খেলোয়াড়ের মতো ক্ষিপ্রতায় সে পোষাক খুলে ছুড়ে ফেললে ওধারে, তারপর গলে গিয়ে জামাকাপড় পরে বললে:

'এবার তাকাতে পারিস!'

খেলোয়াড়ের মতো পা তুলে তুলে সে ভেজা বাগানটায় দৌড়তে শুরু করল। মরকুটে ছুটল তার পেছন পেছন। গরম হয়ে নিচ্ছিল ওরা। আর আমি?..

একলা আমি রইলাম দুয়োরের এপাশে, তলকুঠরিতে। বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকলে সর্বদাই মন ভালো থাকে, দুশ্চিন্তা হয় না, বিশেষ করে তলকুঠরিতে! এখন হঠাৎ একটা ভাবনা দেখা দিল: 'এখন যদি অন্য দরজাটা দিয়ে গ্রিগোরি ভাইপো এসে দাঁড়ায়, তাহলে?' ভাবতেই ভেতর থেকে যেন ঠেলা দিলে, তাড়াতাড়ি করে ওভারকোট ছুড়ে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা ভাবনাও মাথা চাড়া দিলে: 'নাতাশা কুলাগিনার চোখের সামনে ফাঁকটা দিয়ে সেঁধব কী করে?..'

ওর সামনে কোনো একটা অপ্রস্তুত অবস্থায়, হাস্যকর চেহারায় দেখা দেবার কথা ভেবে সর্বদাই আমার ভারি ভয় হত। নাপিত একবার মাকে বলেছিল: 'আপনার ছেলের মাথার পেছনদিকটার গড়নটা সুন্দর, চমৎকার!' আমিও তাই ঘনঘনই মাথার পেছনদিকটা নাতাশার দিকে ফেরাতাম... 'আর এখন সে কিনা দেখবে আমি লাল হয়ে, ফোঁস ফোঁস করে কষ্টে সৃষ্টে ফাঁকটা দিয়ে বেরুচ্ছি!' কথাটা ভাবতেই আমার গা ঠান্ডা মেরে এল। আমার ধারণা মরকুটে যখন শুধু জাঙিয়া পরে দাঁড়িয়েছিল, তার চেয়েও বেশি ঠান্ডা, কেননা আমার এ ঠান্ডাটা যে ভেতরের ঠান্ডা!

তদুপরি মনে হল আমায় শুধু ওভারকোট খুললেই হবে না, কোটও খুলতে হবে। বোঝা গেল আমিও বেশ পুরুষ্টুই। আর কোটের তলে যে শার্টটা আছে সেটা পুরনো, তার অনেক জায়গাতেই তালি মেরে দিয়েছেন মা। তবে শার্টটা ছিল গরম, তাই ওটা সেদিন পরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না শার্টটা নাতাশার চোখে পড়ুক। 'এ সবই ওই গ্রেবটার জন্যে! কী দরকার পড়েছিল ওর?.. কেন?!' মনে হয় এই প্রথম বার রাগ ফলিয়ে আমি তাকালাম তার দিকে। 'আর ওই ভাইপোটার জন্যে! কী করে ওই ভাইপোটার ওপর একটা প্রতিশোধ নেওয়া যায়! অন্তত অল্প হলেও খানিকটা প্রতিশোধ!..'

সেই মুহূর্তে একটা আইডিয়া এল মাথায়।

পকেটে দেখলাম একটা পেনসিল আছে, ছুটে গেলাম তলকুঠরির অন্ধকারে: ইচ্ছে হল ভাইপোর জন্যে একটা স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাই, এমন কোনো একটা লাইন যা পড়ে ও জ্বলে মরবে।

'যাচ্ছিস কোথায়?' এমনভাবে মরকুটে চেঁচিয়ে উঠল যেন চিরকালের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমায় ছাড়া ওর ভয় করছিল! তাতে আমার ভালোই লাগল!

'ভয় নেই, ফিরে আসছি!' সান্ত্বনা দিলাম ওকে। ছুটে গেলাম পুরনো টেবিলটার দিকে, এবং হঠাৎ...

সভয়ে কানে এল, বন্ধ দুয়োরটার ওপাশ থেকে পায়ের শব্দ উঠছে। নেমে আসছে গ্রিগোরি ভাইপো। ও নিশ্চয় আমাদের টিটকারি দেবার জন্যে আসছে: জিজ্ঞেস করবে হয়ত কেমন লাগছে, মন খারাপ টারাপ করছে কিনা। ভাবলাম, 'ও যদি কোনো জবাব না পায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবে যে আমরা চম্পট দিয়েছি, তাড়া করবে আমাদের। আঙিনায় বেরিয়ে এসে ফের সবাইকে পাকড়াও করবে!' দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে ভাগ্যচক্র!

হৃৎপিন্ড আমার আড়ষ্ট হয়ে গেল, হয়ত থেমে গেল একেবারেই। দরজার ওপাশে সিঁড়িতে প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা শোকাবহ প্রতিধ্বনি জাগতে লাগল, যেন আতঙ্কের ফলে বুকটা একেবারে ফাঁপা হয়ে গেছে... সত্যিই তাই!

'ওরে চ্যাঙড়ারা, সব চুপচাপ যে, মা-জননী যেন তোদের জন্মই দেয় নি! ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' হাঁক দিলে ভাইপো।

'ঠিক তাই! সবাই ঘুমুচ্ছে!' জোর গলায় জবাব দিলাম আমি।

'এটা ছোঁড়া সেই তুই?'

'আমিই!'

'ফের মাথা গলাচ্ছিস?'

ভাইপো জানত না যে এই বারটায় আমি নই, বরং মাথা গলিয়েছে এবং বেরিয়ে গেছে বাকি সবাই।

'কোথায় মাথা গলাব, দরজা যে বন্ধ?'

'আরো কিছুক্ষণ বসে থাক! পোড় খেয়ে পোক্ত হওয়া দরকার। কী বলিস তুই? পোক্ত হওয়া দরকার তো?'

'নয়ত কী!'

'তুই তো বাগান বাড়ির বাসিন্দের খোঁজ করতে চাইছিলি না?'

'বটেই তো!'

'খোঁজ পেলি?'

'পেলাম বই কি!'

'দেখলি তো! বলা যায় না, তোকে নিয়েও হয়ত কেউ বই লিখে বসবে।'

'যদি ওই বাসিন্দের অবস্থায় গিয়ে পৌঁছই।'

'হুঁ, হুঁ!'

খিল খিল করে ও এমনভাবে হাসল যেন পয়সা ছড়িয়ে পড়ছে সিঁড়িতে।

'আমাদের তলকুঠরিতে বসিয়ে রাখার কী দরকার পড়ল ওর?' বিবেচনা করে দেখলাম আমি। 'কোনো দরকারই ওর নেই! স্রেফ অন্য কারো হুকুম তামিল করছে।' কার হুকুম — সেটাও জানা কথা। তবে হুকুম তামিল করছে সে বেশ উৎসাহ করেই, লোককে কষ্ট দিয়েই ওর আনন্দ। ওই ওর এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য।

লম্বা করে হাই টানলে ভাইপো। বললে:

'যাই, আমিও একটু গড়িয়ে নিই...'

'ঘুমোবার আগে পায়চারি করার অভ্যেস নেই তো ওর? আঙিনায় যাবে না তো?..' মনে মনে ভাবলাম আমি। ভেতর থেকে আবার আড়ষ্ট হয়ে এল হৃৎপিণ্ড।

তাহলেও তাড়াহুড়ো করলাম না আমি। পকেট থেকে পেনসিল বার করে টেবিলের পাটায় বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখলাম:

ভাইপো! পিসিকে অভিনন্দন জানিও!

সই করলাম: **ডিটেকটিভ আলিক।**

তারপর ছুটে এলাম সেই ফাঁকটার কাছে।

'কিন্তু তালি-মারা শার্টটা যাতে নাতাশার চোখে না পড়ে তার জন্যে কী করা যায়?' মনে মনে ভাবলাম আমি। 'তাই সই, দিনেমার প্রিন্স আর মরকুটের দৃষ্টান্তই নেব। সবাইকে বলব ঘুরে দাঁড়াতে, একেবারে গা খালি করে ফেলব!..'

'কী করলি ওখানে, কোথায় গিয়েছিলি?' তলকুঠরি থেকে মাথা বার করতেই সমস্বরে প্রশ্ন করল সবাই।

আমার জন্যে মন কেমন করছিল ওদের! তাতে আনন্দই হল আমার।

হুকুম দিলাম, 'সবাই মুখ ঘুরিয়ে থাকবে!'

বেশ ঠান্ডা ছিল, চালার কোনখান থেকে যেন জল পড়ছিল টপটপিয়ে, ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমি এগিয়ে গেলাম মুক্তির দিকে।

৯ম পরিচ্ছেদ

যাতে ফের দ্রুত ঘুরতে শুরু করবে ভাগ্যচক্র

অবশেষে বেরিয়ে আসার পর উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ দৌড় লাগানো, স্টেশনে ছোটা, কিন্তু আমি যেন মাটিতে গাঁথা হয়ে চোখ মিট মিট করতে লাগলাম, যদিও রোদের কোনো তেজই ছিল না, বরং একটু অন্ধকারই হয়ে এসেছিল। তাহলেও অনেকক্ষণ দিনের আলো না দেখার পর শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠলাম আমরা!

অপ্রত্যাশিত সব চিন্তায় মাথাটা আমার ভরে উঠল। চিন্তাগুলো এল সব ঠেলাঠেলি করে, কেননা সংখ্যায় তারা অনেক। সত্যি, জীবনের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি খুলে যায় মানুষের!

ভাবছিলাম, মানুষের যদি প্রত্যেক দিন কেবল আনন্দই জোটে, তার মানে তার কোনো আনন্দই জুটছে না। ভাবছিলাম, লোকে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল জিরোয়, তাহলে নিশ্চয় তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আরো ভাবছিলাম, মানুষ যদি প্রত্যেক দিনই আকাশ আর গাছপালা দেখে, তাহলে সেটা তার নজরেই পড়ে না, কিন্তু যদি তাকে তলকুঠরিতে বন্ধ থাকতে হয়, হ্যাঁ, তাহলে সেটা... হয়ত আমার চিন্তাগুলো খুব সঠিক নয়, তবে সঠিকতায় সন্দেহ করা সম্ভব বলেই তো চিন্তার জন্ম হয়।

শেষ পর্যন্ত আমার সুস্থিরতা ফিরল, চিৎকার করে হাঁকিলাম:

'চল স্টেশন!'

'যতই করি, ট্রেন পাব না!' বললে নাতাশা।

'তার মানে? কেন পাব না?'

'কারণ, মাত্র তেইশ মিনিট বাকি, আর স্টেশন থেকে আসতে লেগেছিল চল্লিশ মিনিটের বেশি।'

'আমি তোদের...' শুরু করলে গ্লেব।

কিন্তু ঠিক তখনি স্টিম ইঞ্জিনের একটা লম্বা দরাজ হুইসিল শোনা গেল। ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইসিলগুলো হয় কেমন অন্যরকম, অত লম্বা নয়, তাছাড়া অমন দরাজও নয়। হঠাৎ একটা আন্দাজ খেলে গেল মাথায়।

'গ্লেব!' ইঞ্জিনের হুইসিলটা ততক্ষণে থেমে গেলেও তার চেয়েও জোরে চ্যাঁচাবার চেষ্টা করে বললাম, 'গ্লেব! হুইসিল শুনে বুঝতে পারছি স্টেশনটা খুবই কাছে। আমাদের তুই ঘুরপথে নিয়ে এসেছিলি... চেয়েছিলি...' কিন্তু গ্লেব ঠিক কী চেয়েছিল, সেটা তখনো কাউকে শোনাবার

ইচ্ছে হল না আমার: তদন্ত তখনো শেষ হয় নি, 'মোট কথা, আমাদের সবচেয়ে সোজা পথটা দিয়ে নিয়ে চল!'

'আমি নিজেই... মানে এই কথাই...'

ছুটলাম আমরা। তীক্ষ্ম ভবিষ্যতানুভূতির ফলে আমার মনে হচ্ছিল স্টেশনটা এক্ষুণি দেখা দেবে, বাগান বাড়ির বেড়া ঘেঁষা পাইন বনটা পেরলেই। কিন্তু মনে হয় আগেই তো একবার বলেছি, লম্বা পথও এক এক সময় মনে হয় অল্প, আর অল্প পথও মনে হয় ভয়ঙ্কর লম্বা, বিশেষ করে যদি সবসময় ঘড়ি দেখতে হয়, আর কান খাড়া ক'রে শুনতে হয় ট্রেনের আওয়াজ আসছে কি না। ভাবলাম, 'ট্রেন অবিশ্যি মাঝে মাঝে দুএক মিনিট দেরি করে, কিন্তু যখন তার দেরি করা দরকার, সে সময় সে নির্ঘাৎ সময়মতো, বলতে কি আগেই এসে যায়।'

সবসময় কেবলি পিছিয়ে পড়ছিল মরকুটে। তীক্ষ্ম ভবিষ্যতানুভূতির ফলে আমার মনে হল ও এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। একেই তো ভয়ে ওর দফা সারা। তাতে আবার তলকুঠরি থেকে বেরতে হয়েছে ন্যাংটা হয়ে। ওতেই ওর হয়ে গেছে।

না, মরকুটে ভেঙে পড়ল না, তার আগেই চট করে বসে পড়ল একটা কাটা গাছের গুঁড়িতে।

কচি পাইনগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কিছুদিন আগেও একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছ ছিল, কেন জানি তাকে কাটা হয়েছে, হয়ত সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছিল বলে, হয়ত অন্য কোনো কারণ আছে। গুঁড়িটা বেশ চওড়া, আমরা ছয় জনই তাতে এ'টে যেতাম। কিন্তু মরকুটে বসেছিল একেবারে মাঝখানটায়, ফলে আর কারো জায়গা হল না। তবে আমাদেরও জিরিয়ে নেবার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

সবকিছুই হাঁপাচ্ছিল মরকুটের — নাক, বুক, পেট, কাঁধ, এমন কি পাদুটোও। মানে সঠিকভাবে বললে, পাদুটো কাঁপছিল।

আমরাও থেমে গেলাম।

'আমায় ছেড়ে দে, তোরা চলে যা,' এমন সুরে মরকুটে বললে যেন ভয়ানক জখম হয়েছে, 'আর পারছি না...'

'আমি তোকে বয়ে নিয়ে যাব!' এই বলে দিনেমার প্রিন্স ওকে পিঠে তুলতে গেল। ছুটে এল গ্লেব।

'আমিও... তাতে সহজ হবে...'

এই সময় দূর থেকে ট্রেনের আওয়াজ শোনা গেল।

'ওটা শহর থেকে আসছে...' বললে গ্লেব।

'নিশ্চয়, আমাদের ট্রেনটার এখনো সময় হয় নি,' সায় দিলে দিনেমার প্রিন্স।

নাতাশা তার ঘড়িটি দেখলে।

'সতের মিনিট এখনো আছে। না, না, ষোলো...'

দিনেমার প্রিন্স আর গ্লেব মরকুটের দুই বগলে কাঁধ দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু সগর্বে সে সরিয়ে দিলে তাদের।

'আমি নিজেই যাব!'

'বেশ তো, গেনা...' আস্তে করে বললে নাতাশা, 'পারলে চল...'

কে'পে উঠল মরকুটে: আমাদের মধ্যে অনেকদিন কেউ ওকে ওর আসল নাম ধরে ডাকে নি। আমরা স্রেফ ভুলেই গিয়েছিলাম যে ওর নাম গেনা। আমার মনে হয়, মরকুটে বোধ হয় তখনই সত্যি করে টের পেলে কতটা অস্থির হয়ে উঠেছে নাতাশা। হঠাৎ উঠে এমন জোরে সে সামনে দৌড়ল যে পাল্লা ধরা দায় হল।

প্রায় কোনো ডিটেকটিভ গল্পেই ধাবন ও পশ্চাদ্ধাবন ছাড়া চলে না। আমরাও ছুটছি... ছুটতে ছুটতেই ফুরসুত করে ভেবে নিলাম, 'অবিশ্যি পশ্চাদ্ধাবনটা নেই, সেটা সত্যিই আফসোসের কথা। গ্রিগোরি ভাইপো যদি আমাদের পেছু পেছু তাড়া করে আসত, আর আমরাও যদি সময়মতো গাড়িতে উঠে পড়তে পারতাম আর ঠিক তার নাকের ডগাতেই ট্রেনের দরজা বন্ধ হয়ে যেত, হ্যাঁ, তাহলে সেটা হত খাসা! তবে লোকে যে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছোটে, সেটা কেবল খারাপ লোকের তাড়া খেয়ে নয়, ভালোর তাড়াতেও!'

আমাদের কয়েক জন ছুটছিল নাতাশার মায়ের জন্যে দুর্ভাবনায়, আর অন্যদের, বলা ভালো অন্য একজনকে, মানে, নাম করে বললে গ্লেবকে, ছোটাচ্ছিল বোধ করি তার বিবেক। অভিজ্ঞ চোখ প্রায় নির্ভুলভাবেই বলে দিতে পারে যে তার মধ্যে বিবেক জাগতে শুরু করেছে। আর তীক্ষ্ম ভবিষ্যতানুভূতির ফলে মনে হল তা অচিরেই পুরো জেগে উঠবে।

সে দিনটা আমি সবসময়েই কিছু না কিছু ভেবেছি, কিছু না কিছু লক্ষ করেছি, কিছু না কিছু ভবিষ্যতানুভূতি টের পেয়েছি... বিচার করে দেখলাম: 'জমাট কোনো ঘটনা না থাকলে জমাট কোনো চিন্তাও দেখা দেয় না, কেননা পর্যবেক্ষণ থাকে না সে সময়। আর জরুরী কোনো ঘটনা ঘটলে মাথায় চিন্তা আসে একেবারে ভিড় করে। সেই জন্যেই আমার কাহিনীটায় ভাবোচ্ছ্বাস ও নানা ধরনের চিন্তাভাবনা এত বেশি। কিন্তু প্লট আমায় তাড়া দিচ্ছে, তাই বিরত থাকতে হচ্ছে ভাবোচ্ছ্বাস থেকে... সত্যি, আর কিছু নয়, ঘটনা থেকেই জন্ম নেয় গভীর সব চিন্তা! সেটা আমি নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছি। আর দ্যাখো, এটাও তো একটা চিন্তা! মানে, চিন্তা বিষয়ে চিন্তা!'

আর এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আড়ষ্ট হয়ে নিশ্চল হয়ে গেলাম।

পা আমার সঙ্গে সঙ্গেই কোনোরকম হুঁশিয়ারি না দিয়েই যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল। পেছন থেকে কে যেন ধাক্কা খেলে আমার সঙ্গে। আমি কিন্তু ফিরেও তাকিয়ে দেখলাম না—কে। আর আমার সঙ্গে যার ধাক্কা লেগেছিল, তার সঙ্গে ধাক্কা লাগল অন্য আরেকজনের... সড়কে সামনের গাড়িটা হঠাৎ থেমে গেলে যা হয়, ঠিক তেমনি।

পাইন বনের ভেতর দিয়ে আমি সামনের দিকে দেখছিলাম। বনটা কাঁচ, ছাড়াছাড়া, তার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল যে ট্রেনটা স্টেশনে এসে ঢুকল শহরের দিক থেকে নয়, উল্টো দিক থেকে। 'তার মানে যে ট্রেনটা শহরে যাবে... এটা সেইটেই। যার জন্যে আমরা ছুটছি!' ব্যাপারটা আমায় পুরোদস্তুর বিশ্বাস হতে না হতেই হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

ওহ্, কত ধনঘনই না জীবন আমাদের অপ্রত্যাশিতের সামনে ঠেলে দেয়! একেই বলে ভাগ্যচক্রের দ্রুত পরিবর্তন!

নাতাশা হাতঘড়িটা কানে তুলল। বেশ চোখে পড়ল, হাত ওর কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে কাঁপুনিটা আমার মধ্যেও শুরু হল। তবে কাঁপুনিটা শুরু হল ভেতরে, নিজের মধ্যে, তাই কারো চোখে পড়ল না।

সেদিন আমাদের সকলকারই কাঁপুনি ধরেছিল সেই তো প্রথম নয়, আর ধরার কারণও ছিল বৈকি!

'চলছে...' বললে নাতাশা, 'সকালে রেডিওর সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছি।'

কান থেকে ঘড়ি নামিয়ে নিলে নাতাশা। আগে কখনো লক্ষ করি নি যে ওর কানদুটো অমন ছোট্ট, ছিমছাম, চুলের সঙ্গে এ'টে লাগা। ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল সে কান কিছু আনন্দের কথা শুনুক!

বললাম, 'ট্রেন দেরি করে এলে যখন সুবিধা হয়, তখন তা মাঝে মাঝে আগেই এসে পড়ে বটে... এটা আমি দেখেছি। কিন্তু পনের মিনিট আগেই এসে পড়ে না। হয়ত মিনিট খানেক কি দুই...'

'তাহলে ব্যাপারটা কী?' ব্যাজার সুরে বললে মরকুটে, 'সেই কঙ্কালটার মতো? দৃষ্টিভ্রম?'

বললাম, 'বেশি পাণ্ডিত্য ফলাস না। ফয়সালা করছি। আজকে কী বার?'

হাত তুললে মিরোনভা, পাছে কেউ ওর আগে বলে দেয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি করে জানাল: 'রবিবার!'

'তার মানে...'

'...ছুটির দিন!' বললে মিরোনভা।

আমি ধীরে ধীরে যুক্তি দিলাম:

'আর ছুটির দিনে...'

'...বাড়তি ট্রেন দেয়!' তাড়াতাড়ি করে আমার কথাটাকে সম্পূর্ণ করলে মিরোনভা। স্কুলের দিদিমণি বা সাধারণভাবে কোনো ওপরওয়ালার মুখের কথাটা কখন আঁচ করতে হবে, সেটা মিরোনভা বেশ ধরতে পারত।

'ঠিক!' সায় দিলাম আমি, 'এটা হল বাড়তি ট্রেন। পাঁচটার ট্রেনটা ঠিক সময়েই আসবে। আমি নিজেই যে টাইম-টেবিল দেখেছি... স্টেশনে!'

ফের আমরা ছুটতে লাগলাম। সবার চেয়ে জোরে ছুটলাম আমি: ওটা যে সত্যিই বাড়তি ট্রেন, প্রতিদিনকার সাধারণ ট্রেন নয়, সেটায় নিঃসন্দেহ হবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমায় ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল কেবল গ্লেব। বুঝলাম, কৃতিত্ব দেখাবার ইচ্ছে হচ্ছে তার, যাতে অন্তত খানিকটা অপরাধ কাটে... তাহলেও সবার আগে আমিই গিয়ে পে'ছিলাম টিকিট কাটার জানলায়। আশা আমার পূর্ণ হল। তবে পূর্ণ না হলেই ভালো হত!.. জানলার কাছে সময় আর কতকগুলো শব্দসমেত তালিকা ঝুলছে, যেমন: 'প্রতিদিন', 'রবিবার', 'পরের

স্টেশনগুলির প্রত্যেকটিতে থামিবে'... ফলকটা দুই ভাগে আধা-আধি বিভক্ত: 'শহর হইতে', 'শহর অভিমুখে'।

তালিকাটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি।

'এই তো... যা বলেছিলাম: ঠিক পাঁচটায়!'

'ওটা শহর থেকে,' পেছন থেকে আস্তে করে বললে নাতাশা।

'সে কী! তাই নাকি? হতে পারে না!' স্রেফ মুখ থেকে বেরতে লাগল কথাগুলো, উত্তেজনার ফলে আর কি। নিজেই তো দেখছিলাম যে নাতাশার কথা ঠিক।

'আমাদের ধরতে হত চারটে পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা, যেটা চলে গেল...'

'তাই নাকি? হতে পারে না! সে কী করে হয়?'

'পরের ট্রেনটা আসবে চার ঘণ্টা বাদে,' বললে নাতাশা, 'এ ব্রাঞ্চটায় ট্রেন আসে খুব দেরি করে। খুবই দেরি করে... বিশেষ করে হেমন্তে। সেই জন্যেই যখন আসি, তোকে দেখে নিতে বলেছিলাম...'

'ঈস, কী করে ঘটল এটা?!' বোকার মতো টাইম-টেবিলটার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম আমি। মুখ ফিরিয়ে নাতাশার চোখাচোখি তাকাতেও লজ্জা হচ্ছিল। 'সকালে তাড়াহুড়ো করেছিলাম, ভেবেছিলাম, যত তাড়াতাড়ি পারি নাতাশার অনুরোধ মেটাব। ওহ্, কী মোক্ষমই না ওই প্রবচনটা: 'তাড়াহুড়ো ক'রে লোক হাসোবি ওরে!''

তবে লোকেরা কিন্তু কেউ হাসল না।

'বাড়ি পেঁাছব এগারোটার আগে নয়,' বললে নাতাশা, 'অথচ মাকে বলে এসেছিলাম, ছ'টা কি সাতটা... ভাবতেই পারছি না কী এখন হবে। ভাবতেই পারছি না... কী করলি আলিক, বল তো?'

'এটায় কী আর না বোঝার কিছু আছে? ও যদি সকালে মন দিয়ে টাইম-টেবিল দেখত, তাহলে ট্রেন ধরা যেত,' বললে কিনা সেই মরকুটে যে কিছু আগেও তলকুঠরিতে জীবনের কাছ থেকে বিদায় নিতে বসেছিল, 'আমরা আর একটু পা চালিয়ে আসতাম।'

কত নিষ্ঠুর চমকই না জীবন আমাদের দেয়! এখন দাঁড়াল যে সব দোষই আমার। ভাইপোর কথা এর মধ্যেই ভুলে গেছে সবাই। আমি যে বিধাতার মতো ওদের পরিত্রাণের পথ আলো করে দিলাম, তাও ভুলে গেছে (সে আলো এসে পেঁাছয় কেবল তখন, যখন 'কাছে আসিবে না!' কথা লেখা সেই প্লাই উডের টুকরোর কাছে গিয়ে আমি তা ঠেলে ফেলি)। ভুলে গেছে যে তলকুঠরি থেকে বার করে এনে ওদের মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছি আমিই। ভাইপোর কবল থেকে স্বাধীনতা, ভয়ঙ্কর সে বন্দিদশায় আরো কতক্ষণ সে যে আমাদের আটকে রাখত, কে বলবে।

বহুদিন থেকেই আমি লক্ষ করেছি, লোকে কেবল তোমার শেষ কীর্তিটাই মনে রাখে। অনেক বড়ো বড়ো ভালো কাজ করলেও শেষ কাজটা (যত ছোটোই তা হোক) যদি খারাপ দাঁড়ায়, তবে লোকে শুধু সেইটুকুই মনে রাখে।

টাইম-টেবিলের গণ্ডোগোলটা অবশ্য হয়েছিল একেবারে সকালের দিকেই, তাহলেও সেইটাই

যেন হয়ে দাঁড়াল আমার শেষ কাজ এবং আমার ভুলটা, সকালের এই দৈবাৎ করা ভুলটাতেই আমার সমস্ত কীর্তি নাকচ হয়ে গেল। শুধু ওই ভুলটাই ওরা মনে রেখেছে। প্রচণ্ড এই অবিচারে আহত হল আমার হৃৎপিণ্ড... তবে সেটা যে আহত হয়েছে তা কাউকে বুঝতে দিলাম না!

গ্লেবের কথা কেউ কিছু জানত না, এটাও অন্যায়, আমাদের আটকে রাখবার জন্যে ও যদি ভাইপোকে না বলে রাখত, তাহলে কোনো রোমহর্ষক ঘটনাই তো ঘটত না। কিন্তু গ্লেবের মুখে চুনকালি দেবার ইচ্ছে হল না আমার। কেননা প্রবাদে বলে: 'পরের দুঃর্ভাগ্যের ওপর নিজের সুখের বিল্ডিং বানাস নে!' মানে, কথাটা আমার বাবা বলেছিলেন দাদা কস্তিয়াকে। দাদা সে সময় একটি মেয়েকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইছিল, যাকে ভালোবাসে দাদার বন্ধু। কথাটা শুনে দাদাও আর মেয়েটাকে নেমন্তন্ন করে নি।

তদন্ত তখনো শেষ হয় নি। অপরাধের উদ্দেশ্য তখনো স্পষ্ট নয়। 'কেন? কেন গ্লেবের দরকার পড়ল যে?..' প্রশ্নটা আমায় কুরে কুরে খাচ্ছিল। তাহলেও গ্লেবেরও যে কোনো কিছু দোষ থাকতে পারে এমন কোনো ভাবই আমি দেখাই নি। যদিও পুরো অপরাধটা একা নিজের কাঁধে নেবার চেয়ে তা দুজনের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া অনেক সহজ। আর গ্লেব তো ছিল পাশেই, মনে হচ্ছিল যেন বলছে, 'দে আমায়! কঠিন কোনো একটা কাজের ভার দে!' প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছিল সে...

টিকিট ঘরের জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল নাতাশা, তখনো তাকিয়ে ছিল টাইম-টেবিলটার দিকে, খুঁটিয়ে দেখছিল... তার মুখের ভাবটা এমন যে গালের ওপর বৃষ্টির ফোঁটাগুলোকেও মনে হচ্ছিল চোখের জল। ফের দৃঢ়তা ফিরে এল আমার। 'এইখানেই, এই টিকিট ঘরের সামনেই কিছু একটা উপায় বার করতে হবে! শুকিয়ে দিতে হবে ওই জলের ফোঁটা! হাসি ফোটাতে হবে ওর মুখে! হ্যাঁ, এ আমার কর্তব্য। তখন নাতাশা এবং বাকি সবাই আমাকে ফের তাদের উদ্ধারকর্তা বলে মানবে। লোকে মনে রাখে শুধু শেষ কীর্তিটাই।'

এবং এই সময়... বিদ্যুতের মতো একটা আইডিয়া খেলে গেল আমার মগজে। তবে কারো সেটা চোখে পড়ল না, কেননা খেলল মগজের ভেতরে।

১০ম পরিচ্ছেদ

যাতে শোনা যাবে তলকুঠরি থেকে চিৎকার

'তোদের এখানে ডাকঘর আছে?' গ্লেবকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'স্টেশনের পেছনে, বেশি দূর নয়। ওই দিকে...' মিরোনভার মতো ঝটপট জবাব দিলে গ্লেব। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল যেন ওর কলঙ্কিত অতীতের কথা আমি ভুলে যাই।

'সেখানে টেলিফোন বুথ আছে? ট্রাঙ্ক কলের?' •

'আছে একটা...'

'একটাতেই যথেষ্ট!' এমন সাজোরে ও সানন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম যে সবাই আমার কাছে ছুটে এল।

'আমি জানতাম, তুই কিছু একটা উপায় বার করবি! তোর যে প্রতিভা আছে!' বললে দিনেমার প্রিন্স, অপরের প্রতিভার কদর করেই সে চলেছে।

'এখন আমরা ডাকঘরে গিয়ে নাতাশার মা এবং সাধারণভাবে আমাদের সবাইকার মা-বাবাদের বাঁচাব। ফোন করে বলব যে কোনো দুশ্চিন্তা নেই, আটকে গেছি, রাত নাগাদ পৌঁছব। গ্লেব আমাদের রাস্তা দেখাবে।'

'চমৎকার হবে!' আমায় আলিঙ্গনের জন্যে তার লম্বা লম্বা হাতদুটো বাড়িয়ে বললে প্রিন্স, 'চমৎকার ব্যাপার, অথচ খুব সোজাসাপটা; টেলিফোন করে জানিয়ে দাও: এ যে একটা আবিষ্কার!'

অপরের আবিষ্কারের প্রতিও ওর শ্রদ্ধা ছিল বিস্তর। ফের সবাই আমার দিকে চাইলে উচ্ছ্বাস চেপে না রেখেই: শেষ কীর্তিটাই লোকে মনে রাখে।

হঠাৎ মুষড়ে পড়ল প্রিন্স।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

'একেবারেই মনে ছিল না, আমাদের বাড়িতে যে টেলিফোন নেই... যাক গে, কিছু হবে না। আমার মা-বাবারা তেমন ভয়-কাতুরে নয়।'

তাহলেও চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। কিছু একটা মাথা খাটিয়ে বার করবার সময় আমার মধ্যে একেবারে চেন-রিয়্যাকশন শুরু হয়ে যায়, আইডিয়ার পর আইডিয়া শেকল গেঁথে চলে। এবারেও তাই হল। পায়ের পাতার ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আমি কোলাকুলি করলাম ভালোমানুষ প্রিন্সের সঙ্গে।

'তোর ঠিকানা দিস, আমি দাদা কস্তিয়াকে জানিয়ে দেব ফোনে। সে গিয়ে তোর মা-বাপকে শান্ত করে আসবে।'

নাতাশার যে টেলিফোন আছে, তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। মাঝে মাঝে আমি ওর নম্বরে ডায়াল করতাম, আর ও যখন টেলিফোন ধরত, কোনো কথা না বলে আমি ফোঁস ফোঁস করে রিসিভারে নিঃশ্বাস ফেলতাম। একবার সে বলেছিল, 'কে নিঃশ্বাস ফেলছেন ওখানে?' তারপর থেকে আমি আর ও কম্ম করি নি।

'পথ দেখা আমাদের, সুসানিন*!' গ্লেবের দিকে চেয়ে সগাম্ভীর্যে বললে মরকুটে।

গ্লেবের দিকে আলগোছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলাম আমি। না জেনেই একেবারে লক্ষ্যভেদ করে বসেছে মরকুটে: সকালে গ্লেব সুসানিনের মতোই আমাদের পথ ভুলিয়ে দিয়েছিল। তবে সুসানিন কাণ্ডটা করেছিলেন শত্রুদের সঙ্গে, গ্লেব তার বন্ধুদের সঙ্গে। এইটেই হল নীতিগত পার্থক্য!

---

* রুশ চাষী; ১৬১৩ সালে ইনি বৈদেশিক আক্রমণকারীদের পথ দেখাবার নাম ক'রে এমন দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে তাদের নিয়ে যান যেখান থেকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারে নি।

গ্লেবের পেছু পেছু ছুটলাম আমরা। কেন ছুটলাম বলা মুশকিল: কেননা পরের ট্রেন আসতে তখনো ঢের বাকি। তবে সেদিন আমাদের কেমন জানি ছোটাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যেন সর্বদাই কেউ আমাদের পেছু তাড়া করছে। দুঃখের বিষয় পশ্চাদ্ধাবনটা কেউ করছিল না!

প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়ে চলেছে। এখানে ওখানে বৃষ্টির জল জমে ছিল, নির্ঘাৎ আমাদের পা গিয়ে পড়ছিল সেখানে। কাদার চেহারাটা ঘন বাদামী মোহনভোগের মতো, তৃপ্তির সঙ্গে তা চাটার শব্দ উঠছিল পায়ের তলে। বৃষ্টি বেড়ে উঠছিল, তাজা করে তুলছিল আমাদের। গাছগুলো আদর করে তাদের কালো কালো বাঁকাচোরা হাতগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছিল আমাদের দিকে...

গ্লেব ছুটছিল সবার আগে। আমরা পথ চিনি না বলে নয়, আগের মতোই সে তার দোষ কাটাতে চাইছে।

'ওই-ও-ই-টে!' ছুটতে ছুটতেই চ্যাঁচাল গ্লেব, আঙুল দেখাল একটা একতলা বাড়ির দিকে, তার গায়ে শাদা অক্ষরে নীল সাইন-বোর্ড: 'ডাক, তার, টেলিফোন'।

'আর একটু পরেই,' ভাবলাম আমি, 'নাতাশা টেলিফোন বুথে ঢুকবে, তবে বাইরে থেকেও তার কথাগুলো সবই কানে আসবে। আমিও শুনব: 'মা, কিছু ভাবনা করো না!' তারপর সে বেরিয়ে এসে আমার দিকে আলগোছে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিপাত করবে। তারপর আমরাও ফোন করব। পয়সায় কুলিয়ে যাবে, কেননা বাড়ি থেকে পকেট খরচা পেয়েছিলাম, আর তলকুঠরিতে পকেট খরচার মতো কিছু ছিল না।'

বাড়ির জানলাটা আমায় হাতছানি দিয়ে এমনভাবে ডাকছিল যে আমি গ্লেবকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। ভেতর থেকে যে ওটা খড়খড়ি টেনে বন্ধ করা, সেটা চোখে না পড়া পর্যন্ত জানলাটা আমার কাছে ভারি আপন বলে মনে হচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা পিছিয়ে পড়লাম আমি, বাড়িটায় পেশছল গ্লেবই প্রথম। তবে বারান্দায় না উঠে আমায় সে পথ ছেড়ে দিলে। ছুটে গিয়ে দরজার কড়া চেপে ধরলাম, দেখা গেল কড়াটা ঠাণ্ডা আর ভেজা। আর দুয়োরটা দেখা গেল বন্ধ।

নোটিশ-বোর্ডে লেখা আছে: 'রবিবার — বন্ধ'।

ওহ্, জীবন কী বিষণ্ণ চমকই না আমাদের দেয়!

সকলেই চাইল আমার দিকে। চোখে তাদের কিছুকাল আগের উল্লাসের লেশমাত্র নেই। আমি ছিলাম বারান্দাটায়, আর একটু নিচে, ফাঁকা গাঁয়ের ভেজা মাটিতে, বৃষ্টির তলে, বন্ধ ডাকঘরের কাছে বাকি পাঁচ জন। এবং ফের তাদের মনে হতে লাগল আমারই দোষ: সকালে যদি আমার দেখতে ভুল না হত, তাহলে এতক্ষণে তারা রেলগাড়ির গরম কামরায় বসে নিজের নিজের মা-বাবার কাছে চলে যেত। কিন্তু আমিই গুলিয়ে ফেলেছি... ওদের কাছে ফের এটা হয়ে দাঁড়াল আমার শেষ কীর্তি। আর আমি না থাকলে ওদের সবাইকে যে তলকুঠরিতে বসে থাকতে হত, সে কথা কারো মনেও পড়ল না!

এই সবই ভাবছিলাম, হঠাৎ নজর পড়ল নাতাশার চোখের দিকে, দেখলাম সে চোখ যেন অন্য কথা বলছে। তাতে রয়েছে প্রতীক্ষা, আশা। সেদিন বার কয়েক যেমন দেখেছি। এখনো আমার ওপর ভরসা করে আছে সে।

ফের চেন-রিয়্যাকশন শুরু হয়ে গেল আমার, একের পর এক আইডিয়া ঢুকতে লাগল মাথায়।

'যদি পরের স্টেশন পর্যন্ত দৌড়ে যাই? কতদূর সেটা?'

'আধ ঘণ্টার দৌড়,' বললে গ্লেব, 'কিন্তু সদর ডাকঘর এইটে... সেখানে টেলিফোন বুথ নেই...'

'রবিবারে সর্বত্রই রবিবার!' বিষণ্ণ টিপ্পনি কাটলে মরকুটে, 'তুই কি ভেবেছিস ওখানে এর মধ্যেই সোমবার শুরু হয়ে গেছে?'

'ও কথা কেন?' হঠাৎ বাধা দিলে প্রিন্স, 'ল্যাঙ মারার কী আছে?'

'ও যদি এমনি চালায়, তাহলে আমাদের মা-বাবার দফা শেষ!'

'মরকুটে, আলিককে ছুঁবি না বলছি!' ঠিক তেমনি ভয়ঙ্কর গলায় বললে প্রিন্স, যেভাবে আমায় একদিন বলেছিল: 'মরকুটেকে ছুঁবি না!'

বক্ষপিঞ্জরে তার স্পন্দিত হত মহানুভব এক হৃদয়!

এই সমর্থনটা পেয়ে অনুপ্রেরণা এসে গেল আমার।

'আচ্ছা গ্লেব, কাল তুই শহর থেকে ট্রাঙ্ক কল করেছিলি কোথায়? ভাইপোকে আগেই জানিয়ে দেবার জন্যে... মানে, ওই ব্যাপারটা আর কি... তুই বেশ বুঝতে পারছিস। কোথায় ফোন করেছিলি?'

'বাগান বাড়িতে।'

'তার মানে, টেলিফোন আছে সেখানে?'

'আছে। মানে দাদুর... টেলিফোন স্টেশনে উনি একবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাই ওঁকে... ফলকে লেখাও আছে: 'কৃতার্থ পাঠকদের পক্ষ থেকে গ্র. বরোদায়েভের জন্যে'...'

'ওই টেলিফোন থেকেই তুই ফোন করবি, নাতাশা!' বারান্দা থেকে এমনভাবে ঘোষণা করলাম আমি, যেন ওটা এক সভামঞ্চ, 'তারপর যদি সময় থাকে, আমরাও ফোন করব।'

'উঁহু...' বললে গ্লেব, 'তুই গ্রিগোরিকে চিনিস না। ও করতে দেবে না... আমরা যে ওকে...'

প্রধান কথাটা গ্লেব তখনো জানত না। টেবিলের ওপর আমি যে লেখাটা লিখে এসেছি: 'ভাইপো! পিসিকে অভিনন্দন জানিও!' সেটা তো সে পড়ে নি। আর গ্লেব না পড়লেও ভাইপো যদি সেটা ইতিমধ্যে পড়ে থাকে, তাহলে? তাহলে সে আমাদের কিছুতেই টেলিফোনের কাছে ঘেঁষতে দেবে না! তদুপরি ফের ঠেলে পুরবে তলকুঠরিতে... ওর সামনে দাঁড়াতে হবে ভাবলেই আতঙ্ক হচ্ছে!

এই সব আমি মনে মনে ভাবছিলাম, কিন্তু মুখে বললাম:

'রেখে দে তোর ভাইপোকে! একজনকে ছয়জন...'

'পারবে না!' কথা প‌ূরণ করলে মিরোনভা, এবং জীবনে এই প্রথম বার প‌ূরণ করলে ঠিক য‌ুতসইভাবে নয়।

'ভয় পায় না!' সংশোধন করে দিলাম ওকে। এবং প‌ুনরব‌ৃক্তি করলাম, 'একজনকে ছয়জনের ভয় পাওয়া উচিত নয়!'

'তুই গ্রিগোরিকে চিনিস না,' ফের বললে গ্লেব, 'ও যে জেলে গিয়েছিল... আর আমরা তো জেলে যাই নি... ওর সঙ্গে পেরে উঠব না...'

'দেখা যাবে!' বীরত্ব ফলিয়ে বললাম আমি। কিন্তু আগের মতোই বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম: 'প‌ুরনো বাগান বাড়িটায়' যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি করার কেমন যেন ইচ্ছে হচ্ছিল না।

আমায় উদ্ধার করলে আবার এক চেন-রিয়্যাকশন: আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে জ‌্বলজ‌্বল করে ঝলক দিলে একটা নতুন আইডিয়া।

'ও আমাদের আঙ‌ুলেও ছোঁবে না!'

'আঙ‌ুলে অবশ্যই নয়,' বললে মরকুটে, 'তবে ওর ম‌ুঠোটা দেখেছিলি?'

'দেখি নি! এবং আমাদের কেউই তা দেখবে না,' বললাম নিশ্চিত ভঙ্গিতে, 'খোদ ভাইপোকেও তোরা কেউ দেখবি না!'

'কিন্তু সে কি সম্ভব?' মরকুটের সন্দেহ যাচ্ছিল না।

'সম্ভব!'

'ভাইপো কি বলতে চাস উধাও হয়ে গেছে? হাওয়া?'

ভয়ের ঠেলায় মরকুটে ফের সেই প্রশ্ন দিয়ে কথা বলতে শ‌ুর‌ু করেছে।

'তোরা বাগান বাড়িতে ঢুকে দেখবি — বাড়ি খালি,' বললাম আমি, 'বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'হচ্ছে,' বললে নাতাশা।

আমার কাছে এটা একটা জয়মাল্য।

'চল, ছ‌ুটি!' হাঁক দিলাম আমি।

এবং ফের ছ‌ুটলাম সকলে।

কেউ যদি সেদিন দ‌ূর থেকে আমাদের ছোটাছ‌ুটিগ‌ুলো দেখত, তাহলে নিশ্চয় ভাবত যে খ‌ুব তাজ্জব ও সন্দেহজনক কিছ‌ু একটা ঘটছে। প্রথমে আমরা ছ‌ুটলাম বাগান বাড়ি থেকে বনে। তারপর থেমে মরকুটের চার ধারে হতাশ হয়ে হাত নেড়েচেড়ে ফের ছ‌ুটলাম। তারপর থামলাম প্ল্যাটফর্মে, হতাশ হয়ে হাত টাত নাড়লাম, তারপর পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটকিয়ে ছ‌ুটলাম ডাকঘরের দিকে। ফের থামলাম, ফের হাত-পা নেড়ে বৈঠক করে ছ‌ুটলাম উল্টোম‌ুখে বাগান বাড়ি... এবার সবসময়ই আমি ছ‌ুটছিলাম আগে আগে দলপতির মতো; আর পাখি, কুকুর এবং অন্য যে কোনো ঝাঁকেই তো একটি করে দলপতি থাকেই থাকে। এবার আর গ্লেবের সাহায্য দরকার পড়ে নি, নিজেই আমি পথটা চিনে গেছি।

পথে বার কয়েক জিরিয়ে নিলাম। সবাই নিজের নিজের ঢঙে। মরকুটে ধপ করে কোনো গ‌ুঁড়ি বা বেঞ্চিতে বসে পড়ে নাক, ম‌ুখ, পেট, কাঁধ — সর্বাঙ্গ দিয়ে হাঁপাত। দিনেমার প্রিন্স

খেলোয়াড়ের মতো উঁচু উঁচু পা ফেলে হাঁটত আর হাত তুলে নামিয়ে জোরে জোরে সমান তালে নিঃশ্বাস নিত। আমার কাছ থেকে দূরে কোথাও পায়চারি শুরু করত গ্লেব: আমার চোখ আর প্রশ্ন এড়াতে চাইছিল সে। মনে হল যেন ওর ইচ্ছে আমি ওর অস্তিত্বই ভুলে যাই। ভুলে যাই তদন্তের কথাটাও, যা এখনো শেষ হয় নি: সময় পাচ্ছি না। হঠাৎ মাঝে মাঝে মাথা ফেরাত সে, যেন গাছপালা পেরিয়ে আমার এই প্রাণান্তকর সন্দেহটা ওকে ধাক্কা দিয়েছে: 'গ্লেব, কেন তুই এ কাজ করলি, কেন?!'

রীতিমতো হাঁপাতে থাকলেও মিরোনভা হাতটি তুলে জিজ্ঞেস করত: 'জিরিয়ে নেওয়ায় দরকার আছে কি?' যেন বলতে চায়, দরকার থাকলে এবং হুকুম হলে সে না থেমে আরও ছুটতে রাজী।

তবে সাধারণভাবে সবার চেহারাই ঘর্মাক্ত ও আলুথালু। এমন কি আমিও অলক্ষ্য ভঙ্গিতে কপাল থেকে ক্লান্তির বিন্দু মুছে নিলাম। শুধু নাতাশার ক্ষেত্রেই ক্লান্তিটা যেন তাকে বেশ মানিয়ে গেল। গালের হালকা লালিমা আর বড়ো বড়ো ধূসর চোখের যে ঝলকে আমার চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল শুধু তা থেকেই আন্দাজ করা যায় যে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জীবনে এমন কোনো পরিস্থিতিই নেই যা নাতাশাকে হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত করতে পারে। সবকিছুতেই ওকে মানিয়ে যায় আর তা ভেবে কেমন ভয় হল আমার...

মোটেই যা পুরনো নয় সেই 'পুরনো বাগান বাড়িটা' যখন চোখে পড়ল, আমার বন্ধুরা তখন আরেকবার জিরিয়ে নেবে বলে ঠিক করলে। বাড়িটার কাছে যেতে ভয় হচ্ছিল ওদের। হ্যাঁ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির বলে আমি টের পেলাম যে ওরা ঘাবড়েছে।

গ্লেব বরাবরই একটু কুঁজো হয়ে থাকে, মনে হয় তার পায়ের নিচের মাটিটা বুঝি অধ্যয়ন করছে। আগে ওটা ছিল তার বিনয়ের লক্ষণ, কিন্তু আগেই বলেছি, সে দিন এটা সে করছিল আমার চোখাচোখি হবার ভয়ে। আমি যে অনেক কিছু বুঝেছি, অনেক কিছু জেনে ফেলেছি ওর সম্বন্ধে, যদিও দু'একটি জিনিসের এখনো কিনারা হয় নি...

তাহলেও শেষ হল্টটায় গ্লেব আমার কাছে এসে বললে:

'গ্রিগোরিকে তুই চিনিস না... সবাই ওকে ... মানে, যমের মতো! ও যে জেলে ছিল... মারপিটের দায়ে কয়েদ ছিল!'

বললাম, 'ফের কয়েদ থাকবে!'

'কোথায়?'

'আগে যেখানে ছিল সেখানে নয়, তবে কয়েদ থাকবে। আপাতত এটা গোপন ব্যাপার।'

অন্যেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-পা ও-পা করতে লাগল, আর চোখ দিয়ে আমায় থামাবার চেষ্টা করলে। ওদের দৃষ্টি যেন বলছিল: 'গাল ফোলা গোবিন্দের মা, চালতে তলায় যেও না, চালতে তলায় আছে হনু, গাল ধরে ধরে খাবে চুমু!' প্রবচনগুলো যে কত সত্যি সে কথা ভেবে বারবার তারিফ করলেও, এটা কিন্তু ঠিক মনে ধরল না। প্রবচনের সঙ্গে সংঘাত বাধল আমার।

শেষ পর্যন্ত দিনেমার প্রিন্স আর পারল না, চেঁচিয়ে উঠল:

'তোর সাহস আছে আলিক! আমাদের মধ্যে তুই-ই সবচেয়ে সাহসী!'

পরের সাহসের কদর করে ও।

'আমি জানি যে আমার পদ্যগুলোয় খুব একটা আনন্দ কারো হয় না,' বললে সে, 'কিন্তু অভ্যেস যাচ্ছে না...'

'কীসের অভ্যেস?'

'মানে, মনের ভাব কবিতায় ব্যক্ত করা।'

'এ কথা বলার কারণ?'

'কারণ, মাথায় কয়েকটা লাইন খেলে গেল। যখন আমরা দৌড়াচ্ছিলাম। একটু সরে আয় এদিকে। চাপা গলায় তোকে শোনাব। শুধু তোকে! শুনবি?'

আমি জানতাম, আমাকে নিয়ে খারাপ কিছু বলবে না প্রিন্স। তাই ভাবছিলাম, প্রিন্সের মাথায় যে কয়েক ছত্র খেলে গেছে সেটা নাতাশাও শুনুক। প্রিয়জনের সাক্ষাতে যদি কেউ প্রশংসা করে, সে তো আরো আনন্দের কথা।

আমি যেন প্রিন্সের অনুরোধ মেনেই একটু ওদিকে সরে গেলাম। অবশ্য সেই দিকে, যেখানে দাঁড়িয়েছিল নাতাশা। বললাম:

'পড়ে শোনা! তবে একজনকেই শোনাতে হবে এমন কী কথা আছে। আর চাপা গলাতেই বা কেন? আপন গানের গ্রীবা পদদলিত করে লাভ কী?'

বুঝিলাম আমি, পদ্য অথবা নম্বর
চিরকাল কেউ কভু রাখে নাকো মনে।
দেখালি আলিক, দিন হোক মেঘডম্বর,
লোকের যা যশ, সে তার কর্মগুণে!
সাহসীর জয়গান মোরা আজ গাই,
অক্ষত দেহে ফিরবি, এইটে চাই!

তবে দিনেমার প্রিন্স নিজেও তো আর কাপুরুষ নয়। বললে:

'শোন, আমিও তোর সঙ্গে যাই, কেমন?'

'আমিও যাব,' বললে নাতাশা।

ও বললে মাত্র দুটি কথা, পাঁচটি অক্ষর। তাহলেও তা আমায় জ্বালিয়ে তুললে (মানে, ইতিবাচক অর্থে)।

আমি মরতে চাই — মরকুটের মতো একথা বলার কোনো সাধই আমার ছিল না। উল্টে বরং, নাতাশার ঐ পাঁচটি অক্ষরের পর যতদিন পারা যায় বেঁচে থাকার যা ইচ্ছে হচ্ছিল, তা আর কখনো হয় নি! কিন্তু নাতাশার মাকে উদ্ধারের মতো একটা উন্নত লক্ষ্যে আত্মবিসর্জনের যে প্রেরণা পাচ্ছিলাম, তাও আর কখনো পাই নি। সেই সঙ্গে আমাদের সকলের মাকেই উদ্ধার করা। কেননা বাপেরা উদ্ধার পাওয়ার বিশেষ অপেক্ষা রাখে না বলেই আমার ধারণা।

ওই শেষ হুল্টটাতেই আমি বুঝলাম যে ভালোবাসা লোককে অনেক কিছুতেই অনুপ্রাণিত করতে পারে।

বললাম, 'আমার দুর্ভাগ্য ভাগ নেবার জন্যে তোদের এই ইচ্ছে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। বিশ্বাস কর, তোদের গানের গ্রীবা পদ্দলিত করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না! তাছাড়া প্রবচনেও বলে: 'একক যোদ্ধা যোদ্ধা নয়!'

এই সময় টের পেলাম মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার প্রাচীন লোক প্রবচনের সঙ্গে আমার সংঘাত বাধছে। ভাবলাম: 'জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কেবল লোক প্রবচনই খাটবে, নিশ্চয় এমন নয়।' সে দিন চিন্তা আর সত্যোপলব্ধি আমায় একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

বললাম, 'এই ক্ষেত্রে কিন্তু একলা যোদ্ধাই একান্ত আবশ্যক। তবে তোরা সবসময় আমার কাছেই থাকবি।' তাকালাম নাতাশার দিকে: 'আর যদি না ফিরি...'

'অক্ষত দেহে ফিরবি!' নিজের কবিতারই উদ্ধৃতি দিলে প্রিন্স।

'চেষ্টা করব,' বললাম আমি।

'তুই চলে যাচ্ছিস?' মনমরার মতো জিজ্ঞেস করলে মিরোনভা; দলপতি ছাড়া থাকতে ও ভয় পাচ্ছিল। যতই হোক, আমিই তো দলপতি!

'ফন্দিটা তোর কী?' জিজ্ঞেস করলে নাতাশা। 'বল না, কী মতলব ফেঁদেছিস?..'

'আমি তোদের টেলিফোনের পথ খুলে দেব! ভাইপোকে সরিয়ে দেব আমি!'

'সরিয়ে দিবি? তার মানে? একেবারে দৈহিক অর্থে?' সভয়ে ফিসফিস করলে মরকুটে, 'তার অর্থটা কী?'

'যা দরকার সেই অর্থে!'

'সরিয়ে দিবি?' হতভম্বের মতো বললে গ্লেব, 'কিন্তু এটা যে... জানিস, ও... ওকে সবাই এখানে... যমের মতো!'

ইচ্ছে হল জবাব দিই: 'তুই বেশি বকিস নে!' কিন্তু সামলে নিলাম। তদন্ত কিন্তু শেষ হয় নি, সবার সামনে ওকে অপরাধী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেবার অধিকার আমার নেই।

'তার মানে একলা যাচ্ছিস? শেষ কথা?' জিজ্ঞেস করলে প্রিন্স।

টের পেলাম, টান-টান মুহূর্তটাকে টেনে লম্বা করতে চাইছে ওরা। এমন দৃষ্টিতে ওরা চাইছে যেন চিরবিদায় নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। ওটা আমার সহ্যের বাইরে। তাই চূড়ান্ত পদক্ষেপ করলাম: মানে ওভারকোট খুলে ফেললাম।

'ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' বললে নাতাশা।

'কী করা যাবে? দরকার!'

হাত বাড়িয়ে আমার ওভারকোটটা নিলে সে। ভেবেছিলাম বলি: 'যদি কিছু হয়... ওটা থাকবে আমার স্মৃতি হয়ে...' কিন্তু বললাম না।

'কিছু যদি হয়... তুই চ্যাঁচাস,' বললে প্রিন্স। সদুদ্দেশ্যেই কথাটা বললে। আমি কিন্তু তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে চাইলাম।

'চেঁচাব? কিছুতেই না!'

'তাহলে আমরা করব কী? চুপচাপ বসে থাকব?'

'গাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে থাকবি। আমি সংকেত দেব। যখন আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অলক্ষ্যে হাতের ইশারা করব, বুঝবি: ভাইপোর হয়ে গেছে!'

'চিরকালের জন্যে?' জিজ্ঞেস করলে মরকুটে।

'চিরকাল নাকি অল্পকাল, তাতে কী এসে যায়? প্রধান কথা, টেলিফোনের পথটা খোলা! তোদের আমি অলক্ষ্যে হাত নাড়াব...'

'অলক্ষ্যে কেন? হাত নাড়াস খোলাখুলি। নইলে হয়ত নজরে পড়বে না,' বললে প্রিন্স।

'সাবধান থাকিস...' আস্তে করে মিনতি করলে গ্রেব।

'এইটে আগে ভাবলেই পারতিস!' মনে মনে জবাব দিলাম ওকে। তারপর নির্ভয় দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম বাগান বাড়ির দিকে, ঝুঁকি, কীর্তি ও নিখোঁজের অভিমুখে।

আর প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়েই চলেছে। জোর ধরল বৃষ্টিতে। আমি জানতাম যে আমার বন্ধুরা আমার প্রতিটি গতি লক্ষ করছে, দেখছে কী ভাবে হাওয়ার ঝাপটায় ফুলে উঠছে আমার পোষাক, মূর্তিটা আমার ধীরে ধীরে যেন গলে যাচ্ছে ঘন বৃষ্টি ধারার মধ্যে...

বাগান বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। বুক এমন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে হাত দিয়ে তা চেপে ধরলাম। এবং উঠতে লাগলাম ক্যাঁচকেঁচে সিঁড়িটা দিয়ে যা মোটেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে না। প্রতিটি পদক্ষেপেই কাছিয়ে আসছিল হয় জয় নয়... তবে ও কথাটা না ভাববারই চেষ্টা করছিলাম।

ওপর থেকে ফের বিড়বিড়ানি কানে আসছিল:

'ও, এখনো ধড়ফড় করা হচ্ছে? তাহলে তোদের এক্ষুনি শেষ করছি! আ, এই ফন্দি?.. তাহলে তোর ঘাড়ে গদাম!'

আমার মনে হল কথাটা যেন আমার উদ্দেশেই বলা। ফলে থেমে গেলাম। তবে শুধু এক মিনিটের জন্যে। তারপর সন্দেহের অবকাশ না দেবার জন্যে ছুটে উঠলাম সিঁড়ি দিয়ে। ভূতপূর্ব বাসিন্দের ঘরখানার কাছে আরেক মুহূর্ত দাঁড়ালাম: হাট করে খুলে দিলাম কোটটা, পুরনো শার্টটার তালিগুলো ছিঁড়ে ফেলে সেটাও হাট করে খুলে ধরলাম যাতে জায়গায় জায়গায় গা দেখা যায়। তারপর ঠেলা দিলাম দরজায়। আগের মতোই ভাইপো তার নিজের সঙ্গেই 'গাধা পিটোপিটি' খেলছে।

চেহারাটা আমার এমনই ভেজা আর আলুথালু যে মনে হল ভাইপো আমায় প্রথমটা চিনতে পারে নি। তারপর খুঁটিয়ে দেখে টেবিল থেকে তার প্রকান্ড দেহটা ওঠালে।

'তুই নাকি... ছোঁড়া?'

'আমিই' বলে এমনভাবে নিঃশ্বাস নিলাম যাতে ও বোঝে যে আমি প্রায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছি।

'দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়েছিস?'

'উঁহু... আমি বেরিয়েছি দুয়োর দিয়ে। যেটা জং মেরে গেছে, অল্প একটু খোলে। ওভারকোট

ছুড়ে ফেলে গলে আসি। দেখছেন তো, জামা ছিঁড়ে গেছে, তবে বেরিয়েছি। অন্যেরা আটকে যায়, আবার ফিরে গেছে। আর আমি সোজা আপনার কাছে!'

'চম্পট দিলি না যে বড়ো?'

'আপনাকে একটা কথা বলবার আছে... একটা খবর!'

'তোর ছোঁড়ার সাহস আছে দেখছি। আর যদি তোকে ফের কৌটোয় মাছ পোরা করে ওখানে পুরি?'

'পুরুন-না! আমি নিজেই খুশি হয়ে ঢুকতে রাজী! তবে আগে কথাটা শুনুন। আমি আপনাকে জানাতে চাই যে...'

ওর ছোট্ট মুখখানায় ফের ব্যঙ্গের হাসি ছাড়া আর কিছুরই ঠাঁই কুলোল না।

'আমি তোদের ছেড়েই দিতাম, খানিকটা পরে,' হি হি করে হাসল সে, 'তবে নিজেরাই যখন শিঙ নাড়াচ্ছিস, তখন সাবধান! লেখা ছিল 'কাছে আসিবে না!' আর তুই ছোঁড়া কাছে গেলি? তার মানে, তোর ওতে বয়েই গেল! ফের পুরব তোকে, চুপচাপ বসে থাকবি যেন মা-জননী তোকে জন্মই দেয় নি!'

'পুরুন-না! তবে আগে কথাটা শুনুন!'

'কীসের কথা?..' আমার দিকে সে এমনভাবে হাত-ঝাপটা দিলে যেন মশা তাড়াচ্ছে।

'ওখানে আমরা... অসাধারণ দামী একটা লেখা আবিষ্কার করেছি! টেবিলের পাটায়। একেবারে টেবিলের পাটায়! আপনি নজর করেন নি, কেননা লেখাটা পেন্সিলে, কিছু কিছু মুছে গেছে। কিন্তু জরুরী জিনিস! লেখা আপনার উদ্দেশেই!'

'আমায়?'

'আপনাকেই ব্যক্তিগতভাবে! বুঝে দেখুন!'

'ব্যক্তিগতভাবে আমায়?'

'আপনাকেই! বিশ্বাস হচ্ছে না? চলুন দেখবেন!'

'টেবিলের ওপর?'

'স্রেফ গোল টেবিলটার পাটায়। কী একটা কাগজের জন্যে মিউজিয়ম যখন আপনাকে ধন্যাবাদ জানিয়েছে, তখন লেখা-সমেত টেবিলটার জন্যে তো... হয়ত আপনার ছবিই টাঙিয়ে রাখবে মিউজিয়মে। যত লোক দেখতে আসতে সবাইকে বলবে!..'

'কিছু পয়সাও ছাড়বে হয়ত?'

'নিশ্চয় দেবে!' নিশ্চিত সুরে বললাম আমি, 'প্রথমত টেবিলটার জন্যে। এটা যে লেখকের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট একটা বস্তু। তাঁর রচনার সঙ্গে জড়িত! তার ওপর ওর মাত্র তিনটে ঠ্যাং... আর মিউজিয়মে, জানেন তো? জিনিস যত পুরনো, যত ভাঙাচোরা হবে, ততই তার চাহিদা। শুনেছেন তো, কথায় বলে 'যাদুঘরের জিনিস'? তার মানে, ভাঙাচোরা বা ছেঁড়াখোঁড়া জিনিস। দ্বিতীয়ত, লেখাটা যে আপনার নামে! ফলক এ'টে দেবে: 'ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে'... এরকম লেখে, আমি দেখেছি। ছবি টাঙাবে... আপনার ছবি!'

'থাক, বিদ্যে ফলাস নে!' ফের আমার দিকে হাত-ঝাপটা দিলে ভাইপো, 'এ সব জিনিস বোঝার সাধ্যি তোর নেই। নে, চল দেখি। যদি সত্যি হয়, তোদের সবাইকেই বার করে আনব। আর যদি মিথ্যে হয়, তাহলেও বার করে আনব বটে... তবে তোর দেহটা থেকে প্রাণটা! বুঝেছিস তো?'

নিজের আহ্লাদে ও খিলখিল হাসি ছড়াল। তারপর দু'তিনটে করে ধাপ ডিঙিয়ে নামতে লাগল নিচে। কোনোক্রমে তাল রাখতে পারছিলাম আমি।

'শুধু যেন ফেঁসে না যায়,' ভাবলাম আমি, 'ফেঁসে যদি যায়... তাহলে তলকুঠরিতেই আমার মৃত্যু। সেটা কিন্তু আইদা আর রাদামেসের মতো হবে না। হাজার হোক, তারা ছিল দুজন। আমার প্রাণ যাবে একলা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে! সব স্থির হয়ে যাবে ঠিক সেকেণ্ডখানেকের মধ্যে। এই এইবার! এইবার...'

কপাল থেকে ভয়ের বিন্দু মুছে নিলাম। এমন কি খুব অভিজ্ঞ চোখ না হলেও নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারত যে আমি ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম। কী সৌভাগ্য যে নাতাশা কাছে নেই!

শেষ পর্যন্ত তলকুঠরিতে ঢোকার দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। হুড়কোটা ধরলে ভাইপো। লোহার ওপর মরচে ধরা লোহার গোঙানি উঠল। তারপর বিলাতি তালার চাবি ঘোরালে সে।

'ঢোক রে ছোঁড়া...'

'না, না, সে কী করে হয়! আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনার একটা সম্মান তো আছে! আপনি আগে...'

'বড়ো যে ভদ্রতা দেখছি! ভদ্রতা ফলানো দেখতে পারি না।'

তলকুঠরির স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে পা বাড়ালে সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার প্রাণপণ লাথি খেয়ে ঝট করে বন্ধ হয়ে গেল দুয়োর, বন্ধ হয়ে গেল অটোমেটিক বিলাতি তালা, যার চাবি কারো কাছে নেই... তাহলেও সাবধানের মার নেই ভেবে বহু কষ্টে লোহার হুড়কোটা টেনে দিলাম।

'কী ব্যাপার রে ছোঁড়া?' শোনা গেল দুয়োরের ওপাশ থেকে।

'না, না, আপনাকে আর বিরক্ত করব না,' বললাম আমার বিদ্বেষের আনন্দ চাপা না দিয়েই।

'খোল বলছি! খো-ও-ল্!'

'আমাদের বেলায় আপনি খুলেছিলেন?'

'শোন ছোঁড়া! তুই আমার হাতে...'

'আপাতত, আমি নই, আপনিই পড়েছেন আমার হাতে... বসে থাকুন তলকুঠরিতে।'

'দাঁড়া তবে, তোর বন্ধুদের দেখাচ্ছি!.. ওদের সব্বাইকে! মা-জননী যেন ওদের জন্মই দেয় নি!.. আমি ওদের...'

'ওদের পেলে তো!'

'আমি ওদের!

'কঙ্কালটার সঙ্গে বসে থাকুন!'

দরজায় লাথি মারতে শুরু করলে সে। তবে দরজাটা বেশ পাকাপোক্ত লোহা দিয়ে বাঁধানো।

'অন্য দরজাটা দিয়ে বেরবার চেষ্টা করুন,' উপদেশ দিলাম আমি। জানতাম সরু ফাঁকটা দিয়ে গলতে পারে শুধু ভাইপোর ক্ষুদে মাথাটা। অথবা একটা পা।

'ধাপ্পা দিলি আমায়? ধাপ্পা?'

'উঁহু, সত্যি কথাই বলেছি। টেবিলটার কাছে গেলেই দেখতে পাবেন!'

ওর ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল।

ভাবলাম: 'এই বার টেবিলটার কাছে যাবে... এক্ষুনি পড়বে: 'ভাইপো! পিসিকে অভিনন্দন জানিও!''

'খোল বলছি!' তলকুঠরির গভীর থেকে চিৎকার শোনা গেল, যেন গুহামুখে দানবের গর্জন।

ন্যায়সঙ্গত গর্ববোধে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। টেলিফোনের পথ খোলা। নাতাশার মায়ের আর ভয় নেই!..

১১শ পরিচ্ছেদ

যাতে আমরা নানারকম কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি শুনব...

'কী করে করলি? কী ব্যাপার, বল তো?! বল-না!'

বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'আসল কথা হল ফলটা। তলকুঠরিতে ও বসে আছে কিনা? আছে! তলকুঠরি থেকে চিৎকার করছে কিনা? করছে! বাকিগুলো যাকে বলে খুঁটিনাটি।'

'বিজয়ীকে আবার বিচার করে কে! জিজ্ঞাসাবাদ করার কী আছে?..' ছাড়লে মরকুটে। আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করুক, আমায় নিয়ে উল্লাস করুক—এটা ও চাইছিল না। এবং ওর ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার কোনো মিল না থাকলেও, আমিও বললাম:

'পেছনে তাকিয়ে কী লাভ? বরং সামনের কথা ভাবি!'

'আমি শুনেছি, যে যুদ্ধকর্মে বিজয় হয় সৈন্যেরা তা বিশ্লেষণ করে দেখতে ভালোবাসে,' বললে দিনেমার প্রিন্স, 'তা থেকে সবাই শিক্ষা নেয়।'

আমার ইচ্ছে হচ্ছিল না যে আমার 'যুদ্ধকর্মটার' বিশ্লেষণ মনে মনে করার বদলে সবাইকে শুনিয়ে করি। যতই হোক, ভাইপোকে তো আমি চালাকি করে হারিয়েছি... আর সোজাসুজি একটা সংঘাত, প্রকাশ্য যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসের চেয়ে সর্বদাই চালাকিটা হেয় মনে হয়। ভাবলাম: 'ওরা যদি স্বকর্ণে শুনত কীভাবে কৌটোয় মাছ পোরা করে আমায় ফের তলকুঠরিতে পোরার ভয় দেখিয়েছিল ভাইপো, তাহলে বুঝত যে আমি শুধু চাতুর্যের পরিচয় দিই নি, সাহসও দেখিয়েছি। কিন্তু সেটা ওরা শোনে নি, এখন শোনাও সম্ভব নয়। তাই নিজেরাই বরং ওরা অনুমান করে নিক। হঠাৎ যদি নাতাশা ভেবে বসে যে ভাইপো আমার কাছে জোরে হেরে গেছে, আমায় দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল! তাহলে আমি তার ভুল ভাঙতে যাব না। তবে দুঃখের বিষয়, ও কথা কি

আর সে ভাববে?..' এবং যদিও আমি পেছন দিকে না তাকাবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তাহলেও আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল ওরা ভাইপোর হাঁকডাকটা শুনুক, বুঝুক কী শত্রুকে আমি ঘায়েল করেছি।

টেলিফোন করার জন্যে কারুরই আর তর সইছিল না, কিন্তু আমি বললাম:

'চল, এক মিনিটের জন্যে নিচে যাই!'

নিচে এল সবাই, কেবল গ্লেব ছাড়া... গ্লেব, যে কিনা আমার সমস্ত হুকুম প্রথম পালন করার চেষ্টা করছিল, এমন কি মিরোনভার মতো আগে থেকেই তা আন্দাজ করে নিচ্ছিল, সেই গ্লেবের কানে যেন কথাটা ঢুকলই না। আমি ওর ইচ্ছের ওপর জোর খাটাতে গেলাম না।

হয়ত ওর ভয় হচ্ছিল যে আমি ওকেও তলকুঠরিতে ঢোকাব। কিংবা হয়ত ও ভাবছিল যে ভাইপোকে নিয়ে ঠাট্টা করার কোনো অধিকার ওর নেই, কিছু কাল আগেও ভাইপোই তো ছিল তার বিশ্বস্ত চেলা, তার দোসর! এবং ফের আমার সামনে সেই ধাঁধাটা দেখা দিল যার সমাধান এখনো বাকি: 'কেন ভাইপোকে টেলিফোন করল গ্লেব? কেন আমাদের তলকুঠরিতে বন্ধ করার হুকুম দিয়েছিল? কেন?!'

মরচে ধরা লোহা বাঁধানো দরজাটার কাছে এলাম আমরা। চেঁচিয়ে বললাম:

'তা কেমন চলছে? মেজাজ কেমন?'

দরজাটার ওপারে ভাইপো দাঁড়িয়ে ছিল যেন খাঁচায় পোরা বাঘ।

'খোল বলছি! খো-ও-ল!' ঘর ফাটিয়ে চ্যাঁচাল সে।

সবাই একটু চমকে পিছিয়ে গেল। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু নড়লামও না। এবং ব্যঙ্গের সুর প্রায় চাপা না দিয়েই জিজ্ঞাসা করলাম:

'আমরা তো নিজেদের জোরেই বেরিয়ে এসেছি। আপনার সাহায্য ছাড়াই। আপনিও চেষ্টা করে দেখুন! উদ্যোগ দেখান, বুদ্ধি দেখান! বসে থাকুন, একটু রোগা হয়ে নিন, তাহলে হয়ত আমরা যেখান দিয়ে বেরিয়েছি সেই দরজাটা দিয়ে বেরতে পারবেন...'

'বাড়ি আমি ভেঙে ফেলব!' চ্যাঁচাল ভাইপো।

'পিসির তাতে বড়োই দুঃখ হবে,' শান্তভাবে বললাম আমি। তারপর সবার দিকে চেয়ে বললাম, 'এবার ওপরে! টেলিফোনের কাছে।'

সবাই নীরবে আমার কথা মেনে নিলে। সেই ঘরটায় ঢুকলাম, যা একদা ভাইপোর পিসির কাছে গ্র. বরোদায়েভ ভাড়া নিতেন। সেখান থেকে সরাসরি বারান্দায় যাওয়া যায়, বারান্দা থেকে আঙিনায়।

ঘরটায় কোনো টেলিফোন আমার চোখে পড়ল না। ভেতরটা আমার হিম হয়ে এল: আমার সমস্ত চেষ্টা কি বৃথায় গেল?

কিন্তু পরের মুহূর্তেই ভেতরটা আমার গরম হয়ে উঠল: টেবিল থেকে একটা পুরনো মেয়েলী ড্রেসিং গাউন তুলল গ্লেব, দেখা গেল টেলিফোনটা তার নিচে লুকনো ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী?'

'পিসির ভারি ভয়... পড়শীরা যদি জানে... অন্যান্য বাগান বাড়ির... তাহলে সবাই এসে চাইবে... লুকিয়ে রাখে, যাতে কেউ না জানে। ওটা তো সোজাসুজি!'

'সোজাসুজি মানে?'

'সোজা শহরের সঙ্গে কানেকশন... শুধু দাদুর জন্যে... কৃতজ্ঞতা হিশাবে...'

টেলিফোনটায় ঝাপসা হয়ে আসা ফলক আঁটা ছিল: 'কৃতজ্ঞ পাঠকদের কাছ থেকে গ্র. বরোদায়েভের জন্যে'।

পাশেই একটুকরো কাগজে থানা, অ্যাম্বুলেন্স, দমকল আর কি একটা টেলিফোন নম্বর। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কার?'

'ভাইপোর পিসির,' বললে গ্লেব, 'উনি শহরে থাকেন। ভাইপো ওঁকে টেলিফোন করে সব খবরাখবর দেয়...'

'বুঝলাম।'

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তিতে অবিলম্বেই টের পেলাম যে প্রথম রিসিভার তুলতে কেউ ভরসা পাচ্ছে না। হঠাৎ যদি বিল না মেটানোর ফলে কানেকশন কেটে দিয়ে থাকে? কিংবা যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে?..

হাতের একটা দৃপ্ত ভঙ্গি করে আমি রিসিভার তুলে কানে ধরলাম: হ্যাঁ, ক্রীং ক্রীং করছে। নাতাশার টেলিফোন আমার মুখস্থ ছিল। কিন্তু আমি যে সেটা জানি, তা নাতাশা জানত না। চাইছিলাম না যে নাতাশা সেটা টের পাক। কেননা প্রায় প্রথম শ্রেণী থেকেই তো আমি ওকে টেলিফোন করে রিসিভারে নিঃশ্বাস ফেলতাম। পরে অবশ্য আর নিশ্বাস ফেলতাম না।

'নাতাশা, তোদের নম্বরটা কী?'

নম্বরটা বললে নাতাশা। আমি ডায়েল করলাম... ওপাশ থেকে নারী কণ্ঠ শোনা গেল। ও গলা আমার খুবই পরিচিত: আগে ও গলা শোনামাত্রই টেলিফোন কেটে দিতাম। এবার কিন্তু কেটে না দিয়ে নাতাশাকে দিলাম:

'বোধ হয়, তোর মা।'

'মা-মণি,' এমন নরম গলায় কথাটা ও বললে যে তীক্ষ্ণ ঈর্ষাবোধ ফের আমার বুকে এসে বিঁধল।

ওই সুরে যদি সে কখনো বলত 'আলিক', তাহলে আমার সবকিছু প্রিয় জিনিসই আমি দিয়ে দিতে পারতাম: নতুন সাইকেলটা (দুই চাকার), বল পয়েন্ট পেন, স্টীলের বলসমেত বিলিয়ার্ডটা!

নাতাশা বলে গেল:

'না, না, শহর থেকে নয়... আমরা এখনো এখানেই, বাগান বাড়িতে। ট্রেন ফেল করেছি। সব ঠিক আছে। কিছু ভেবো না। বাড়ি ফিরব রাত এগারোটা নাগাদ। আন্না পেত্রভনাকে বলো যেন না চলে যায়। তোমার কাছে যেন আরেকটু থাকে... যদি পারে আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা

করে। বলবে তো? কথা দিচ্ছ? না, না, সব ঠিক আছে! এখন আমরা বাগান বাড়িতে। না, না, বাইরে নয়। কিছু ভেবো না। মাত্র ট্রেন ফেল করেছি। চুমু নিও!'

এ কথাটা তো আমি জীবনেও শুনব না! বিষাদ না চাপা দিয়েই ভাবলাম আমি।

হঠাৎ নাতাশা বললে:

'ধন্যবাদ তোকে, আলিক!'

'ধন্যবাদের কী আছে?' বলে সজোরে কাশলাম যাতে আমার বুকের ঢিপঢিপানিটা কারো কানে না যায়।

ফের রিসিভার তুলে এগিয়ে দিলাম মিরোনভার দিকে: নারীরা আগে!

'ক' মিনিট কথা বলা যাবে?' জিজ্ঞেস করলে মিরোনভা।

'যতক্ষণ চাস। তুই তো আর পাবলিক টেলিফোন থেকে বলছিস না।'

'কিন্তু এটা বোঝা কি কঠিন?' প্রশ্ন করলে মরকুটে।

'কী?' জিজ্ঞেস করলে মিরোনভা।

'এটা বোঝা কি এতই কঠিন যে অন্যের মা-বাপেও দুর্ভাবনা করছে? সুতরাং দেরি করা উচিত নয়? একি আর বোঝা যাচ্ছে না?'

কথা বলল সে তার পেয়ারের কায়দায়। মিরোনভা চট করে ডায়েল করলে। ডিটেকটিভ হিশেবে আমি তার পুরো কথাবার্তাটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম, মানে, ওপাশ থেকে কী জবাব আসছিল সেটাও।

'ভালেন্তিন নিকোলায়েভিচ!' চ্যাঁচাল মিরোনভা।

'তুই কথা বলছিস...'

'দূর থেকে!' চ্যাঁচাল মিরোনভা।

'খুব খারাপ...'

'শোনা যাচ্ছে তো!' চ্যাঁচাল মিরোনভা, 'কারণ আমি শহরের বাইরে।'

'তোর দরকার...'

'মা-কে! কিংবা বাবাকে। নয়ত ভাই কি বোনকে।'

আমি টের পেলাম যে, মিরোনভা শুধু মাস্টারদেরই নয়, ফ্ল্যাটের প্রতিবেশীদেরও কথা শেষ করতে না দিয়ে নিজেই কথা জুগিয়ে দেয়। যারা ওর চেয়ে বড়ো আর উচ্চপদস্থ—তাদের!

তারপর এল নিশ্চয় ওর ভাই, কেননা মিরোনভা তার নাম ধরে ডাকলে:

'মিখাইল, মাকে বলে দিস যে আমি এগারোটায় ফিরব। কিংবা এগারোটা দশে। কারণ আমরা আগের ট্রেনটা ফেল করেছি। কী বললাম তুই আবার বল তো!'

'তুই এগারোটায় আসবি। কিংবা এগারোটা দশে,' পুনরাবৃত্তি করলে মিখাইল, 'কেননা তুই আগের ট্রেনটা ফেল করেছিস।'

'আমি নই, আমরা সবাই!' কড়াভাবে শুধরে দিলে মিরোনভা, 'আরেক বার বল।'

আবার বললে মিখাইল, তবে এবার ভুল না করে। কেননা রিসিভার নামিয়ে রাখলে মিরোনভা

'চুমু নিস' বা 'বিদায়' এরকম কোনো কথাই বললে না, স্রেফ রিসিভার নামিয়ে রাখলে। বুঝলাম যে মিরোনভা শুধু হুকুম মানতে জানে তাই নয়, হুকুম দিতেও জানে। যারা ওর চেয়ে ছোটো তাদের। ভাইটা যে ওর চেয়ে ছোটো তাতে আমার কোনো সন্দেহই ছিল না। তাহলেও আমার অনুমানটা পরখ করার জন্যে বললাম:

'এ তোর ছোটো ভাই?'

'এক বছর সাত মাসের ছোটো,' বললে মিরোনভা।

তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণশক্তি এবারেও আমায় ঠকায় নি।

মিরোনভা টেলিফোন ছেড়ে আসতেই মরকুটে আমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই ছুটে গেল টেলিফোনে।

কিন্তু তার নম্বরটা ছিল এন্‌গেজড্‌।

'কী ঝামেলা, অন্য সময়ে টেলিফোন করা কি যেত না? তার ওপর এতক্ষণ ধরে?' ঘ্যান ঘ্যান করলে মরকুটে। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, আমি বলছি! অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন এন্‌গেজড্‌ ছিল... তুমি ডিউটি ম্যানকে ফোন করেছিলে? কাকে? ওহ্‌, শহরে? হাসপাতালে? লাস-কাটা ঘরেও?!'

ওর মা এমনই দুশ্চিন্তা করছেন যেন মরকুটে বুঝি মারাই গেছে।

তারপর মরকুটে কেন জানি জানাল যে বাগান বাড়িতে আমরা একলা, অর্থাৎ অভিভাবক ছাড়াই এসেছি। এইখানটায় তার মায়ের গলা এমন পরিষ্কার শোনা গেল, যেন তিনি শহর থেকে নয়, কথা কইছেন পাশের বাগান বাড়ি থেকে। মরকুটে বললে:

'না মা, আমরা নিজে থেকে নই... নিনেল আমাদের অনুমতি দিয়েছিলেন!'

'কেন বল তো? কেন তুই একথা বললি?!' আমি ওর আস্তিন টেনে ধরলাম।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মা চ্যাঁচাতে লাগলেন এই বলে যে, মরকুটেকে হারাবেন বলে তো আর তিনি তার জন্ম দেন নি। বা ওই ধরনের কিছু।

অভিজ্ঞ ডিটেকটিভের মতো আমি ফের সমস্ত কথোপকথনটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম।

'তোদের মাস্টারনী এটা করল কী বলে? আমরা যে ওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম!' চ্যাঁচালেন মা।

'কবে সাবধান করে দিয়েছিলে?' অবাক হল মরকুটে।

এবং আরেকবার আমি বুঝলাম যে জনক-জননী সভায় জনক-জননীদের চেয়ে দাদাদের যাওয়া কত ভালো: ও সভাটার কোনো খবরই মরকুটে জানে না।

'কিন্তু এই শেষ!' মা চ্যাঁচালেন যেন পাশের বাগান বাড়ি থেকে। তবে সব কথা শোনা যাচ্ছিল না, আন্দাজ করে নিতে হচ্ছিল আমায়।

'শেষ মানে? কী অর্থে?' অবাক হয়েই চলল মরকুটে।

আমি টের পেলাম যে নিনেলের যারা সমালোচনা করেছিল, মরকুটের মা তাদের একজন। গ্লেব এমন কুঁজো হয়ে গেল যা আগে কখনো দেখি নি।

'যা! এবার তোর পালা!' আমি বললাম রাগ প্রায় চাপা না দিয়েই।

'আমি পরে... তোর পরে... আমি সবুর করতে...'

'তা তো বটেই: তোর বাড়িতে তো কেউ ভাবনা করবে না! আগেই বলে রেখেছিলি। তুই তো জানতিসই...'

আমার কথাটার মানে অবশ্য আর কেউ বুঝল না। তবে গ্লেব ঠিকই বুঝলে। আগেই সে জানত যে আমাদের ফিরতে দেরি হবে। তার জন্যে সে যা পেরেছে সব করেছে। নিশ্চয় সকালেই বলে রেখেছিল যেন ভাবনা না করে।

'আর নিনেল ফিয়োদরোভনার কথা তুই ভেবেছিলি?' ন্যায়সঙ্গত রাগটা একটু চাপা দিয়ে আস্তে করে বললাম। তারপর কেউ যাতে না শোনে, তাই ফিসফিসিয়ে কিন্তু হুমকি দিয়ে যোগ দিলাম, 'শীগগিরই সব ফাঁস করব। সমস্ত উদ্দেশ্য! কেন তোর এসব দরকার হল?.. এ্যাঁ? পরে বলিস! এখন ফোন কর। যেন কিছুই হয় নি! নইলে সবাই আগেই টের পেয়ে যাবে।'

ইতস্তত করতে লাগল সে।

'ফোন কর, এমন ভাব করবি যেন তোর বাড়িতেও সবাই ভাবনা করছে!'

কথা শুনল গ্লেব।

'আমরা এখানে... আমি একটু দেরিতে... এগারোটায়...' বললে সে তার বাপ, লেখক গ্ল. বরোদায়েভের পুত্রকে, যিনি আগেই ব্যাপারটা ভালোই জানতেন।

দূর থেকে আমি অবজ্ঞার তুহিন ধারা বর্ষণ করছিলাম গ্লেবের ওপর। তবে এমনভাবে যাতে দৈবাৎ অন্যের ওপর সেটা না গিয়ে পড়ে, অর্থাৎ আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে যাতে অন্য কেউ আমার তদন্ত শেষ হবার আগেই কিছু টের পেয়ে না যায়।

তারপর আমি প্রিন্সের ঠিকানা টুকে নিয়ে নিজের নম্বরে ডায়েল করলাম। এটাও অনেকক্ষণ এন্‌গেজড্ ছিল।

'ওরাও কি লাস-কাটা ঘরে টেলিফোন করছে নাকি?' ভাবলাম আমি, 'নাকি কস্তিয়া তার বন্ধুদের সঙ্গে কথা কইছে? সঠিকভাবে বললে বান্ধবীদের সঙ্গে?..' টেলিফোনটা এন্‌গেজড্ রইল মিনিট পনেরর কম নয়। তবে তার বেশিও নয়, কেননা নাতাশার হাতের ঘড়িটা দেখে হিশেব করে নিয়েছিলাম। আমার হাতেও অবশ্য ঘড়ি ছিল, কিন্তু ওর ছোট্ট ঘড়িটাই আমায় টানছিল বেশি। নাতাশার হাতটা ধরে বার বার চোখের কাছে তুলছিলাম। অবিস্মরণীয় সে সব মুহূর্ত!

টেলিফোন এন্‌গেজড্ আর আমি আনন্দে হাসছি। অবাক হয়ে সবাই চাইছিল আমার দিকে।

'এতক্ষণ যখন, তখন নিশ্চয় কস্তিয়া,' বুঝিয়ে বললাম আমি, 'আমার দাদা। প্রিন্সের বাড়িতে ওরই যাওয়ার কথা। ভালোই হয়েছে বাড়িতে আছে!'

শেষ পর্যন্ত কস্তিয়াকে আমার বক্তব্য জানানো গেল।

'আর নিনেল ফিয়োদরোভনাও কি তোদের সঙ্গে?' যে সুরে ও জিজ্ঞেস করলে সেভাবে সাধারণত মাস্টারদের সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করে না, 'উনিও আমায় যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ!' মিথ্যে কথাই বললাম আমি। তবে মহৎ উদ্দেশ্যে!

'তাহলে এক্ষুনি যাচ্ছি। আমার নমস্কার জানাস ওঁকে, আর বলিস সমস্ত জনক-জননী সভায় আমি হাজির থাকব। সভাগুলো যেন একটু ঘন ঘন ডাকে। সেলাম! ফ্রুগলভের বাড়ি চললাম!..'

ফ্রুগলভ হল দিনেমার প্রিন্সের উপাধি।

এমন কি খুব অভিজ্ঞ চোখ না হলেও নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পারত যে আমাদের সকলের মেজাজই শরীফ হয়ে উঠল। মা-বাপেদের জন্যে আমাদের আর ভাবনা ছিল না, কেননা এখন তাঁরা আমাদের জন্যে আর ভাবনা করবেন না।

আমার মা নাতাশার মায়ের মতো অমন রুগ্ন নন। তাহলেও মা-বাপের স্বাস্থ্য নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। একবার আমি রেডিওয় শুনেছিলাম যে দীর্ঘায়ু বংশের ছেলেমেয়ে নাতিপুতিরা সাধারণত দীর্ঘায়ু হয়। অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের কল্যাণে। শুনে ভারি আনন্দ হয়েছিল। আমার ঠাকুর্দা ঠাকুমা, দাদু দিদিমা — চার জনেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন। তার মানে তাঁদের সন্তানদের, অর্থাৎ আমার মা-বাবার অনেক দিন বাঁচার কথা!

একজন দাদু তো এমনই তাগড়াই যে বছর দশেক আগে দিদিমার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করেন, দিদিমাকেও অবশ্য তখন সঠিক অর্থে দিদিমা বলা যেত না, তাই তিনিও দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন। এখন দাদু (মায়ের দিক থেকে) মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসেন যাকে বলে 'তরুণী ভার্যা' নিয়ে, আর দিদিমা (তিনিও মায়ের দিক থেকে) আসেন তাঁর 'তরুণ স্বামী' নিয়ে, যিনি তাঁর চেয়ে বছর পনের বড়ো। আমরা ওঁদের খুবই সমাদর করি, শুধু একটা জিনিসের ওপর কড়া নজর রাখতে হয়: দিদিমা তাঁর স্বামীকে নিয়ে আর দাদু তাঁর বৌকে নিয়ে যেন একই দিনে এসে হাজির না হয়, অর্থাৎ কস্তিয়া যা বলে: 'ধাক্কা যেন না লাগে'।

আমার প্রপিতামহ, প্রপিতামহীদের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম একবার। দেখা গেল তাঁরাও অনেক দিন বেঁচেছিলেন। ফলে এখন একমাত্র কামনা, রেডিওয় যে ডাক্তারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাঁর কথা যেন সত্যি হয়। বংশধারায় আমার খুবই বিশ্বাস! আমার খুব ইচ্ছে যেন মা-বাবা চিরকাল সুস্থ থাকেন।

এও আমি শুনেছি যে বড়োদের চেয়ে ছোটোরা রোগ সহ্য করতে পারে বেশি সহজে। মা-বাবার যখন কোনো অসুখ হত, তখন ভারি আফসোস হত এই জন্যে যে, অসুখ বিসুখ নিজেদের খুশি মতো সংসারের লোকেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় না। তাহলে তাঁদের ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলার ব্যথা, শিরার টান আমি সানন্দেই নিজে নিতাম। এমন কি বাবার শরীরের মধ্যে কোথায় যেন একটা পাথর বেড়ে উঠছে, সেটাকেও আমি আমার শরীরের মধ্যে কোথাও 'রেখে দিতে' একটুও দ্বিধা করতাম না।

আমি জানতাম যে দুর্ভাবনার ফলে বড়োদের রক্তের চাপ বাড়ে, শিরা সরু হয়ে যায়, এবং এমন অনেক কিছুই ঘটে যা আমার কখনো ঘটে নি। মোট কথা, আমরা সময় থাকতেই ফোন করেছি!

সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল যেন নাতাশার মতো তারাও বলতে চাইছে: 'ধন্যবাদ তোকে, আলিক!..'

আর আমাদের সমস্ত মা-বাপ এখন নিশ্চিন্ত বোধ করলেও আমার মনে হল যেন টেলিফোনটার পুরো সদ্ব্যবহার এখনো হয় নি।

'ক্লাসের ছেলেদের কাউকে ফোন করা যাক!' বললাম আমি।

শুরু করলাম পারামোনভকে দিয়ে। এ চরিত্রটির বয়স সাড়ে বারোর বেশি নয়। উল্লাস হল তার স্বভাবের এক প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য। তিলকে সে তাল করতে পারে। আমি জানতাম যে পারামোনভকে ফোন করলে সে ঘটনাটা গোটা স্কুলে রটাবে।

'পারামোনভ,' চাপা রহস্যাচ্ছন্ন গলায় বললাম, 'সোজাসুজি পুরনো বাগান বাড়ি থেকে তোকে অভিনন্দন!'

'তোরা এখনো ওখানে?'

'তা নইলে কোথায়?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! নিনেল ফিয়োদরোভনাও ওখানে?'

'উঁহু, কেবল আমরা।'

'বলিস কী?'

'আয়, নিজের চোখে দেখে যা!..'

'গোটা বাগান বাড়িটায় তোরা একলা?'

'হ্যাঁ, বাড়িটা পুরো আমাদের দখলে।'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার!'

'গভীর রাতে ফিরব।'

'বলিস কী! হতে পারে না...'

'আমার বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞেস কর। কিংবা মরকুটের বাড়িতে। মা-বাপে তো আর মিথ্যে বলবে না!'

'এত রাত করছিস যে?'

'তলকুঠরিতে বন্ধ ছিলাম।'

'অনেকক্ষণ?'

'সাড়ে চার ঘণ্টা। হয়ত বেশি।'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কী করলি সেখানে?'

'ভয়ঙ্কর এক রহস্য ভেদ করছিলাম।'

'ভেদ করতে পারলি?'

'হ্যাঁ, ভেদ আমরা করেছি। কঙ্কালের রহস্য!'

'কার?'

'কঙ্কাল, কঙ্কাল... অবাক হবার কী আছে!'

'সত্যিকারের কঙ্কাল?'

'তুই কি ভেবেছিস, খেলনা কঙ্কাল?'

'কার কঙ্কাল?'

'পুরোপুরি সঠিকভাবে বলা মুশকিল। লোকটা তো আমাদের চেনা নয়...'

'তোরা সেই বাগান বাড়িটায়? উপন্যাসে যার বর্ণনা আছে? মানে, সেই বাড়িটা, যেখান থেকে একটা লোক হাওয়া হয়ে যায়?'

'আমরাও হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম। তবে লড়েছি!'

'কত জনের সঙ্গে?'

'একজন।'

'মাত্র একজন? আর তোরা সাহিত্য চক্রের পুরো দলটা!'

'লোকটাকে তুই দেখলে বুঝতিস... তবে আমরা জিতেছি। এখন সে শাস্তি ভোগ করছে। আমরা ওকে বন্দী করে রেখেছি তলকুঠরিতে!'

তারপর ক্লাসের অন্যান্য ছেলেদের ফোন করতে শুরু করলাম।

শুরু করতাম: 'পুরনো বাগান বাড়ি বলছি!' কিংবা: 'লাইনে পুরনো বাগান বাড়ি! গভীর রাতে আমরা ফিরব...'

আমাদের হিংসে হচ্ছিল ওদের, তাই বলছিল:

'নিশ্চয় নিজেদের ঘরে বসে আছিস?'

'বাড়িতে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে প্যারিস। মা-বাপে তো আর মিথ্যে বলবে না!'

নাতাশা যাতে আমায় অহঙ্কারী না ভাবে তাই বলছিলাম: 'আমরা লড়াই করেছি... আমরা রহস্যভেদ করেছি... আমরা বন্দী করেছি...' যদিও আসলে ভাইপোর সঙ্গে লড়েছি আমি একা, আমি একাই ওকে তলকুঠরিতে পুরেছি। 'আমার ক্লাসের ছেলেদের কাছে নয় আমি এক বেনামী বীর হয়েই রইলাম, কিন্তু নাতাশা তো আমায় সর্বদাই নিরহঙ্কার বলেই জানবে!' কথাটা ভেবে সান্ত্বনা পেলাম।

'কিন্তু স্টেশনে যাবার সময় হয় নি কি?' বললে মরকুটে।

'হয়েছে বৈকি ভায়া, হয়েছে!' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম আমি: তখনো সবাইকে ফোন করা হয়ে ওঠে নি, ক্লাসে আমাদের বেয়াল্লিশ জন ছাত্র।

তখনো সময় ছিল, কিন্তু সন্দেহ তাড়া দিচ্ছিল আমায়: 'যদি আবার কোনো একটা গোলমাল করে বসি? ট্রেনটা যদি আগেই চলে আসে?..'

'ছোটা যাক!' বললাম আমি। হাঁটার অভ্যেস সে দিন আমাদের একেবারেই চলে গিয়েছিল।

'কিন্তু তার আগে তলকুঠরি থেকে ভাইপোকে ছেড়ে দেওয়া দরকার,' বললে নাতাশা।

'ছেড়ে দেব কেন?'

'নইলে যে ওখানে মারা যাবে।'

'ওহ, কী আমার দয়ালু রে!' বুকে হাত দিয়ে বলে উঠলাম আমি।

'বসে থাকুক অন্ধকারে, কারাগারে,' বললে মরকুটে, 'শাস্তিটা কি ওর ন্যায্য পাওনা নয়?'

'আমার ধারণা, মেয়াদ ওর কেটে গেছে,' বলে ঘড়িটার দিকে তাকাল নাতাশা।

আমি আপত্তি করলাম, 'আমরা আটক ছিলাম আরো অনেক বেশি। যদিও কোনো দোষ আমাদের ছিল না। আমাদের চেয়ে ও আটক থাকবে কেন কম?'

ওর কথায় আপত্তি করার ইচ্ছে ছিল না আমার। ওর যে কোনো বাসনা পূর্ণ করাই ছিল আমার স্বপ্ন! 'কিন্তু কী করে ছাড়া যায় ওকে? কী উপায়ে?' চুপ করে ভাবছিলাম আমি, 'সত্যি, ওকে আটক করার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াটা দেখছি অনেক কঠিন!'

ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা সিঁড়িটার কাছে দাঁড়ালাম। সিঁড়িটা নেমে গেছে সোজা লোহার দরজাটার কাছে, লোহার দরজাটা খোলে সোজা তলকুঠরিতে।

'ও তো আর নিজে নয়... এ তো আমি...' আস্তে করে শুরু করলে গ্লেব।

'চুপ করে থাক!' ফিস ফিস করে শাসিয়ে ওর মুখ বন্ধ করলাম: নিজেই ও কবুল করে সব ফাঁস করে দিক, সেটি চলবে না। না, ওটা করব আমি, ডিটেকটিভ!

'নাতাশা ঠিকই বলেছে,' বললে ভালোমানুষ দিনেমার প্রিন্স, 'আমার মনে হয় গ্রিগোরি ভাইপো অনুতাপ করছে... বসে আছে চুপচাপ।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই তলকুঠরি থেকে আওয়াজ এল:

'খোল বলছি! শুনছিস ছোঁড়া? দেয়াল ভেঙে ফেলব! মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব!'

'মুণ্ডু খোয়াতে আমার আপত্তি নেই! তবে এখনো ওটার কাজ ফুরোয় নি: তদন্ত শেষ হয় নি এখনো!' মুখ বাড়িয়ে চেঁচালাম আমি যাতে ভাইপোর কানে কথাটা যায়, 'কয়েকটা জিনিস এখনো অপরিষ্কার... তদন্ত চলবে শেষ পর্যন্ত! বিজয় পর্যন্ত! হয়ত অপরাধ হ্রাসের মতো কোনো ঘটনাও পেয়ে যেতে পারি। তাই আপাতত চুপচাপ বসে থাকুন!'

এবং তাকালাম গ্লেবের দিকে। কুঁজো হয়ে ছিল সে, তার মুখের নরম মখমলী চামড়া জায়গায় জায়গায় ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। মায়া হল ওকে দেখে, তাই ঠিক কী কী জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবং কী এখনো অপরিষ্কার তা আর বুঝিয়ে বললাম না। তাছাড়া অপরাধের উদ্দেশ্য নির্ণয় না করে তো আর ওকে দোষী বলা যায় না। সেটা নিয়ম নয়। আর হয়ত এই সব উদ্দেশ্যের মধ্যে সত্যিই অপরাধ হ্রাসের মতো ঘটনা মিলে যাবে? গ্লেবের অনুকূলে, এমন কি ভাইপোর অনুকূলেও? না, আইন মানতে হবে! আইন!..

'আমি অবশ্য আমার মুণ্ডুটা খোয়াতে রাজী,' ফের বললাম আমি, 'কিন্তু একটা মুণ্ডুতে ওর পোষাবে না... আর তোদেরকে বিপদে ফেলতে আমি পারি না!' বলে চাইলাম নাতাশার দিকে।

'খো-ল ব-ল-ছি!' তলকুঠরি থেকে হেঁড়ে গলায় চ্যাঁচাল ভাইপো। 'বাগান বাড়ি পুড়িয়ে দেব! নিজের প্রাণেরও মায়া করব না!'

'দেখছিস তো? নিজের প্রাণেরও মায়া নেই ওর। আর তোরা ভাবছিস, তোদের প্রাণের মায়া ও করবে। ওহ, কী সহজেই না তোরা বিশ্বাস করে বসিস!'

'কী করা যায় তাহলে? সময় যাচ্ছে,' বললে নাতাশা, 'একটা উপায় কর আলিক!'

সবাই চাইল আমার দিকে। চোখে ওদের আশা। তাতে সাড়া না দিয়ে আমি পারি না!

নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার দৃষ্টি পড়ল খোলা দরজা দিয়ে সোজা

সেই কাগজটার ওপর, যা ছিল টেলিফোনটার কাছে। তাতে লেখা আছে থানা, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স আর ভাইপোর পিসির টেলিফোন নম্বর। সঙ্গে সঙ্গেই একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

'পিসিকে আমরা ফোন করে বলব। কালকে এসে তিনি ওকে খুলে দেবেন!'

'ওই তো... কাগজটায়...' বললে গ্লেব।

'ধন্যবাদ,' বললাম এমন সুরে যেন ওর কথাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। হঠাৎ গ্লেবের অপরাধ হ্রাসের মতো কোনো একটা ঘটনা নিজেই জুটিয়ে দেবার ইচ্ছে হল আমার... যদিও প্রত্যেকবার ওর দিকে চাইলেই একটা প্রশ্নই আমায় জ্বালিয়ে মারছিল: 'কেন? কেন তুই এ কাণ্ডটা করলি?!'

'সকাল পর্যন্ত একটা মানুষকে তলকুঠরিতে বসিয়ে রাখা চলে না,' বললে নাতাশা।

'মানুষকে চলে না। তবে ভাইপোকে...'

জীবনে এই দ্বিতীয়বার আপত্তি করলাম নাতাশার কথায়। একেবারে অসহ্য!

'নিষ্ঠুরতা দিয়ে নিষ্ঠুরতা জয় করা যায় না,' বললে নাতাশা। আমার সন্দেহ ছিল না যে কথাটা সে তার নোটখাতায় টুকে রাখবে। যদিও কথাটায় আমি অমত। শত্রুর প্রতি দয়াই কি আসলে নিষ্ঠুরতা নয়? শত্রুকে করুণা করে কি শেষে নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটাব না? এই ধরনের সন্দেহ আমায় কুরে কুরে খাচ্ছিল।

আমার সন্দেহ ছিল না যে আমার এ ভাবনাটাও নাতাশার নোটখাতায় ঠাঁই পাবে একদিন, যখন ও খাতাটা হয়ে উঠবে আমাদের দু'জনের: তার আর আমার!

হয়ত নাতাশার ভাবনাটা আমার চেয়ে মহৎ। তবে সেদিন যা বুঝলাম, মহৎ ভাবনার ঝামেলা অনেক, জীবনকে বড়ো জটিল করে তোলে। পিসিকে ফোন করলেই ল্যাঠা চুকত! তা নয়: মানুষকে আটকে রাখা চলে না!

বললাম, 'ওকে খুলে দিতে যাবে কেবল একজন। তার আগেই বাকিরা চম্পট দেবে। আগে থেকেই ঠিক করা একটা জায়গায় অপেক্ষা করবে।'

সবাই বুঝলে যে, বিপদে যে এগুবে সে আর কেউ নয়—আমিই। বন্ধুদের চোখে আমার বীরত্ব দেখার জন্যে অধীর আগ্রহ দেখলাম আমি। কেবল আমারই বীরত্ব! কী করা যাবে, আমি নিজেই যে ওদের এই দিকে ঠেলে দিয়েছি। হঠাৎ নাতাশা বললে।

'তোর কিন্তু যাওয়া চলবে না।'

এবং যদিও এই দফায় বীরত্ব দেখাবার কোনো আগ্রহই আমার ছিল না, তাহলেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিলাম:

'কেনই বা আমার যাওয়া চলবে না?'

'কারণ আমাদের চেয়ে তোর ওপরেই ওর রাগ বেশি। তোর মুণ্ডুই তো ছিঁড়তে চাইছিল।'

'তার মানে, আমার মুণ্ডুটা ওর কাছে মূল্যবান!' কথাটা ভাবতেই সর্বশক্তিতে একটা উপায় বার করার নতুন জোর পেলাম।

দৃষ্টি আমার সারা ঘর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গেল গ্লেবের ওপর। তাতে কিন্তু কুঁজো

হয়ে গেল না সে, চোখ এড়াতে চাইল না। সেদিন কেবলি অন্যের চোখে আমি কিছু না কিছু লেখা দেখছিলাম। এবার দেখলাম: 'তোদের সাহায্য করে কিছু দোষ স্খালনের সুযোগ দে...'

গ্লেবকে আমি একটু দূরে টেনে নিয়ে এলাম।

'তুই কি বুঝতে পারছিস যে এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটায় আমরা পড়েছি তোর জন্যে?'

'বুঝতে পারছি।'

'কী উদ্দেশ্যে এটা করলি, সেটা আমার এখনো বার করতে হবে!'

'আমি নিজেই... এখুনি...'

'না, এখন নয়। এখন কোনোক্রমেই নয়! এখন প্রতিটি সেকেন্ডই জরুরী। শেষ ট্রেনটাও ফেল করতে পারি। তখন... মোট কথা, বীরত্ব দেখাতে রাজী আছিস তুই?'

'আমি... নিশ্চয়... তবে যদি...'

''যদি ফদি' চলবে না! রাজী কি না?'

'রাজী।'

'তাহলে তুই নিচে নেমে ভাইপোকে তলকুঠরি থেকে খুলে দিবি। আমাদের মধ্যে একমাত্র তোরই কোনো ক্ষতি ও করবে না। তোর সঙ্গেই তো ওর যোগসাজশ ছিল!'

হ্যাঁ, ও আমাকে... আমি তো সেটা প্রথমে... তার পর তোদের সঙ্গে জুটে... ও সেটা মাপ করবে না!'

'আহ, কী তুই হাঁদা! তুই কি ভেবেছিস আগেই আমি সে সব ভেবে রাখি নি? আবার বলি শোন, সংক্ষেপে, মানে, যাকে বলে সারাংসার। চর্বিতচর্বণের সময় নেই। ভাইপোর কাছে ব্যাপারটা দেখাতে হবে এই — তুই আমাদের দলে নোস, তুই আমাদের বিরুদ্ধে! ভুলিস না! প্রথমে আমরা জোর করে তোকে তলকুঠরি থেকে বার করেছি, কারণ তুই ভাইপোর চর হিশেবে ওখানেই থাকতে চাইছিলি। মনে থাকবে তো? তারপর তুই সহাপরাধীর কর্তব্যবোধে ছুটে গিয়ে ভাইপোকে খালাস করতে চাইছিলি। আমরা তখন তোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি। আর নিজেরা পালাই স্টেশনে... তুই তখন অমানুষিক ইচ্ছাশক্তির জোরে দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যাস সহাপরাধীর সাহায্যে, তাকে খালাস করিস! মনে থাকবে তো? সবটা তোকে দিয়ে আবার বলিয়ে নেবার সময় নেই! শুধু বল, রাজী?'

'রাজী... কিন্তু ও যদি হঠাৎ...'

'ঝুঁকি নিবি! মহৎ কাজ! আর তোর পক্ষে মহৎ কিছু একটা করার এই-ই সময়। রাজী?'

'রাজী...'

অন্যদের কাছে আমি পরিকল্পনাটার একটা অংশই শুধু ফাঁস করলাম, ওরা তো আর জানে না যে অপরাধে গ্লেবেরও হাত আছে।

বললাম, 'আমার সামান্য ফন্দিটা হাসিল করবে গ্লেব বরোদায়েভ! আমাদের কয়েদী বেচারা যাতে ওকে টুকরো টুকরো না করে তার জন্যে ব্যাপারটা দেখাতে হবে এই রকম... গ্লেবের ঠাকুর্দা যেহেতু ভাইপোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলেন, তাই ভাইপোকে বন্দিদশা থেকে খালাস

করার ইচ্ছে গ্লেবের হবে। কিন্তু আমরা তা হতে দিই নি। বরং গ্লেবকে বেঁধে রাখি। আমরা যখন স্টেশনে চলে যাই, তখন ও নিজের বাঁধন খুলে ঠাকুর্দার কোলে পিঠে মানুষ করা লোকটাকে উদ্ধার করে। ভাইপো তার উদার উদ্ধারকর্তাকে আলিঙ্গন করবে! আর আমরা গ্লেবের জন্যে অপেক্ষা করব সেই প্রকাণ্ড গুঁড়িটার কাছে, মরকুটে যেখানে বসেছিল। মনে আছে তো? এইবার ওকে বেঁধে রাখাটাই বাকি!'

'কাকে?' ভয় পেয়ে ফিস ফিস করল মরকুটে।

'অবশ্যই গ্লেবকে! ওর বাইরের চেহারাটাও এমন হওয়া চাই যাতে বোঝা যায় যে এক প্রচণ্ড লড়াই ওকে চালাতে হয়েছে আমাদের সঙ্গে। কালশিটে, আঁচড়... কালশিটে আছে তোর গায়ে?'

'উঁহুঁ, নেই...' অপরাধীর মতো বললে গ্লেব।

'খুঁজে দ্যাখ! মাঝে মাঝে অজান্তেই কোথাও চোট লেগে কালশিটে থেকে যায়। ভাইপোকে কালশিটে দেখানো দরকার!'

গ্লেব তার হাত দুখানায় চোখ বুলাল।

'আর গায়ে? ভালো করে খুঁজে দ্যাখ!'

মেয়েরা মুখ ঘুরিয়ে রইল।

'উঁহুঁ, কোথাও নেই... কোনো কালশিটেই নেই...' বিষণ্ণ গলায় জানাল গ্লেব।

'আঁচড় টাঁচড়ও কিছু নেই?'

'উঁহুঁ, কিচ্ছু নেই...'

'দুঃখের কথা। আমরা তো আর তোকে আঁচড়ে দিতে পারি না!' বললাম জোর গলায়। আর চুপি চুপি গ্লেবের কানে কানে বললাম, 'যদিও তাই উচিত ছিল।'

'তাহলে এখন... কী করা যায়?' জিজ্ঞেস করলে গ্লেব।

'অন্তত জামার বোতামগুলো খুলে ফ্যাল, কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে নে... না, না, ছুড়ে ফেলিস না। হাতে রেখে দে: ভাইপোকে দেখাবি। ওটা হবে বস্তুগত প্রমাণ!'

পট পট করে বোতাম ছিঁড়ল গ্লেব, অপরাধ হ্রাস করার মতো ঘটনাচক্র চাইছিল সে!

'এবার ঠিক করে চুল এলোমেলো কর! এই বার ঠিক হয়েছে। এখন প্রধান কথা: দড়ি দিয়ে তোকে বাঁধব। কিন্তু হাত খোলা থাকবে, যাতে বিলিতি তালাটা তুই খুলতে পারিস। বরং ভালো হবে তোকে যদি চেয়ারের সঙ্গে বাঁধি। তুই স্রেফ পিঠে চেয়ার নিয়েই ওকে উদ্ধার করতে নামবি। হালকা দেখে একটা চেয়ার, যেমন এই বেতের চেয়ারটা...'

'ভারি হলেও... আমার কিছু...'

সবেতেই গ্লেব রাজী!

'দড়ি দে,' হুকুম দিলাম আমি।

কিন্তু কেউ সেটা দিল না, কেননা দড়ি ছিল না...

'বিনা দড়িতেই হয়ত চলে যাবে?' বললে মরকুটে, যত তাড়াতাড়ি হয় স্টেশনে যাবার জন্যে তার আর তর সইছিল না।

'না, চলবে না!' বললাম আমি, 'আঁচড় নেই, কালশিটে নেই!.. তার ওপর আবার দড়িও থাকবে না? আমাদের সঙ্গে গ্লেব যে লড়েছিল তার যত বেশি সম্ভব প্রমাণ চাই। ভাইপোর যেন বিশ্বাস হয়। বন্ধুর জীবন বিপন্ন করতে আমরা পারি না!' তারপর গ্লেবের কানে কানে বললাম, 'যদিও তোর জীবন বিপন্ন করাই উচিত হত।'

পবিত্র এই নিয়মটা আমি প্রায়ই ভুলে যাচ্ছিলাম: তদন্ত শেষ না করে দোষী সাব্যস্ত করবে না। ভুলে যাচ্ছিলাম, তারপর হুঁশ হচ্ছিল। হুঁশ হবার পর ফের ভুলে যাচ্ছিলাম...

কিন্তু গ্লেব রাগ করলে না। অপরাধের তীক্ষ্ম চেতনা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

'ওইখানে, ওই চিলেকোঠায়...' বললে ও, 'কাপড় মেলে... তার মানে, দড়িও...'

'চিলেকোঠায়?' জিজ্ঞেস করলাম ফের।

'ওপরে... অন্ধকার ওখানটা। মোটের ওপর...'

'পথ দেখা!'

'আমিও যাব তোদের সঙ্গে!' বললে মহানুভব দিনেমার প্রিন্স।

'না, এখানে থাকবি,' বললাম আমি, 'ভাইপো যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে! মেয়েদের তখন রক্ষা করতে হবে। অন্তত একজন পুরুষ থাকা চাই...'

'আর আমি?' আস্তে করে বললে মরকুটে, 'আমি কি...'

'নিশ্চয়! অনেক দিন থেকেই তুই মরতে চাইছিস। হয়ত এবার তার একটা উপলক্ষ ঘটবে...'

গ্লেবকে নিয়ে উঠলাম চিলেকোঠায়। ঘর থেকে বেরবার সময় একটা কথা কানে এল। সে কণ্ঠস্বরটা আমি পৃথিবীর কারও গলার সঙ্গেই গুলিয়ে ফেলতে অক্ষম।

'সাবধান!'

ও কথাটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। একটি মাত্র কথা... কিন্তু কী নেই তাতে? উদ্বেগ, তাড়াতাড়ি ফেরার জন্যে মিনতি, অপেক্ষা করে থাকার প্রতিশ্রুতি! বীরকীর্তিতে এগিয়ে দেবার সঙ্গীত। কেননা চিলেকোঠায় কী যে ঘটবে, কেউ তো আর জানে না!

প্রথমে আমরা উঠলাম দোতলায়, সেই ঘরটায় যেখান থেকে সাধারণত শোনা যেত: 'ওহ, এখনো জান যায় নি? তোমাদের এবার গদাম্! একেবারে গর্দানে! এখনো টাঁইফুঁই হচ্ছে? গলায় এবার ধাঁই, ধাঁই, ধাঁই!' ঘর থেকে এক ফালি আলো এসে পড়েছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম... টেবিলটায় টেবিল-ক্লথ নেই, খবরের কাগজ দিয়েও ঢাকা হয় নি। এক গাদা তাস পড়ে আছে। যে বাতিটা জ্বলছে তারও ঢাকনি নেই। যে সিঁড়িটা চিলেকোঠায় উঠে গেছে তার রেলিঙ নেই।

'এই দিকে...' বললে গ্লেব।

আমরা যে সিঁড়ি দিয়ে আরো ওপরে উঠলাম তা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছিল, যদিও গ্ল. বরোদায়েভের উপন্যাসে তার কোনো বর্ণনা নেই। ওপরে কাঠের সিলিঙ, তাতে কোনো পলস্তরা নেই। হ্যাঁ, সবই এখানে কেমন ন্যাড়া, যেন কাপড় জামা না-পরা: টেবিল-ক্লথ ছাড়া টেবিল, শেড ছাড়া বাতি, পলস্তরা ছাড়া সিলিঙ, রেলিং ছাড়া সিঁড়ি...

নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা!

অন্ধকারে আগে এক একটা ধাপ ছুঁয়ে দেখে তারপর পা বাড়াচ্ছিলাম, কেননা একটা অসতর্ক পদক্ষেপেই উল্টে পড়ার আশঙ্কা ছিল, রেলিঙ ধরে বাঁচব এমন ভরসাও নেই, কেননা রেলিঙই নেই।

শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পেঁছিলাম।

চিলেকোঠার চেহারাটা একটা ঢাকনি-বন্ধ কফিনের মতো। আমরা সেই কফিনের গর্ভে, তোফা লাগছিল স্যাঁতসেঁতে পচা গন্ধটা।

ফের একটা ডিটেকটিভী আবহাওয়ায় এসে গেছি: অন্ধকার, রহস্যময়, তিন-কোণা জানলাটা দিয়ে আসছে হাওয়ার শিস আর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টির ঝাপট...

বোঝা গেল, প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়ে চলেছে: আগের মতোই বৃষ্টি চলছে বাইরে।

জানলাটায় শার্সি নেই, আর চিলেকোঠা বরাবর দড়িগুলোয় কোনো কাপড় শুকচ্ছে না। এখানেও সবকিছু ন্যাড়া, ন্যাংটা, কে যেন সব লুট করে নিয়েছে। কথাটা ভেবে আমার বেশ লাগল!..

মনে হল যেন ছমছমে নির্জন কোণটা থেকে এই বুঝি কেউ ঝাঁপিয়ে আসবে। দুঃখের বিষয় তেমন কিছু ঘটল না।

সামনে হাত বাড়িয়ে আমরা অনিশ্চিত পদক্ষেপে, অনিশ্চিত মেটে মেঝের ওপর দিয়ে চিলেকোঠার গভীরে এগুলাম।

এবং হঠাৎ দেখলাম একটা মানুষ... সাদা পোষাকে সিলিঙের নিচে সে ঝুলছে। এবং দুলছে... সারাটা দিন যে সাহস আমার সঙ্গেই ছিল, হঠাৎ তা বিদায় নিলে।

'কী?.. কে ওটা?' ফিস ফিস করেই আমি অনিশ্চিত মেঝের ওপর অনিশ্চিত পদক্ষেপে পিছিয়ে এলাম।

নিশ্চয় আতঙ্কে কথাটা গলার মধ্যেই আটকে গিয়েছিল, গ্লেবের কানে যায় নি। শেষ শক্তি সঞ্চয় করে চেঁচিয়ে উঠলাম:

'কী এটা?!'

গ্লেব বললে, 'জামা, গ্রিগোরি কেচে... মানে, মেলে... বাতাসে ফুলে উঠেছে...'

'ভাগ্যিস, নাতাশা কাছে নেই!' মাথায় খেলে গেল আমার, 'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার যে পতন হয়েছিল, ভাগ্যিস, সেটা তার চোখে পড়ে নি!'

গ্লেব তাড়াতাড়ি করে একটা দড়ি খুলতে লাগল। খুবই আগ্রহ দেখালে সে: অপরাধ লাঘব করার মতো ঘটনাচক্র ওর দরকার।

বিপরীত অনুভূতিতে আমি প্রায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলাম। একদিকে গ্লেবের প্রতি আমি এই জন্যে কৃতজ্ঞ যে আমার মুহূর্তের পতনটার সময় ও কাছে ছিল অথচ লক্ষ করে নি, হয়ত অন্ধকারের জন্যে, হয়ত দড়ি খোলায় ব্যস্ত ছিল বলে। কিন্তু অন্য দিকে আবার আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার স্নায়ু বিকল ও এই ভয়ংকর অবস্থার জন্যে আসলে তো গ্লেবই দায়ী। ও যা

করছে সেটা ও করতে গেল কেন? কী উদ্দেশ্যে? এ জিনিসটা আমার কাছে তখনো পরিষ্কার হয় নি।

কয়েক মিনিট পরে আমরা গ্ল. বরোদায়েভের ঘরে ঢুকলাম। লেখকের নাতির হাতে সেই দড়ি, যা দিয়ে তাকে বাঁধা হবে।

'চুলটা তোর ঠিকই আছে: দিব্যি এলোমেলো!' মন দিয়ে গ্লেবকে নিরীক্ষণ করে বললাম, 'শার্টটাও ঠিক আছে: বোতাম নেই!'

'ওভারকোটের বোতামগুলোও ছিঁড়লে হয় না? দুটো কি তিনটে?' বললে গ্লেব। সব কিছুতেই সে রাজী!

'না, তার দরকার নেই, ঠাণ্ডা লেগে যাবে!' — আমি পড়েছিলাম যে তদন্তাধীনের প্রতি দয়া, অথবা বলা ভালো, সংবেদনশীলতা দেখানো দরকার। 'এবার তোকে কেবল চেয়ারের সঙ্গে বাঁধার কাজটাই বাকি। সবচেয়ে যেটা হালকা, এই-এইটার সঙ্গে...'

বাধ্যের মতো হাত ওঠাল গ্লেব, ঠিক যেন আত্মসমর্পণ করছে। বেতের চেয়ারটার সঙ্গে আমরা তাকে বাঁধলাম। গ্লেবের পিঠ আর চেয়ারটার পিঠ নিবিড় হয়ে জুড়ে গেল।

'মনে রাখিস তুই: ভাইপোকে সাহায্য করার জন্যে এমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলি যে আমরা তোকে বেঁধে রাখতে বাধ্য হই! তাড়াহুড়োয় আমরা খেয়াল করি নি যে চেয়ারটা হালকা, চেয়ার পিঠে নিয়েই তুই ছুটতে পারিস। মনে থাকবে তো? আর প্রধান কথা — আমরা চম্পট দিয়েছি অনেক আগেই। মানে, বাগান বাড়ি ছেড়ে গেছি... চলে গেছি শহরে। বুঝেছিস তো? ভাইপো যেন আমাদের তাড়া করবার কথা না ভাবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'দরজা খুলে আসতে তোর ক' মিনিট লাগবে?'

'ঠিক জানি না... মিনিট দশেক... নয়ত পনেরো...'

'ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া যাক!'

'আমার ঘড়ি নেই।'

'যাক গে, শোন! গুঁড়িটার কাছে তোর জন্যে অপেক্ষা করব ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পনেরো মিনিট! সময় দেখব নাতাশার ঘড়িতে। নাতাশা ক'টা বেজেছে?'

নাতাশা তার হাতটা এগিয়ে দিলে আমার দিকে। আমি তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রাখলাম।

'কী, ভালো দেখা যাচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করলে নাতাশা।

'না, কাঁটায় কাঁটায় বিশটা বিশ মিনিট পর্যন্ত সবুর করতে চাই। বেশ মনে থাকবে: বিশটা বিশ!'

নাতাশাও ঘড়ি দেখল:

'কিন্তু তার যে এখনো পুরো চার মিনিট বাকি।'

'তা যাক, একটু সবুরই করি।'

ঠিক বিশটা বিশে আমি বলে উঠলাম:

'এইবার শুরু হচ্ছে! গ্লেব, সব মনে আছে তো? ভাইপোকে বিশ্বাস করাতে হবে যে আমরা বাগান বাড়ি ছেড়ে চলে গেছি! শহরে রওনা দিয়েছি... কিন্তু আসলে অপেক্ষা করছি গুঁড়িটার কাছে!'

'মনে আছে...'

আমি গ্লেবের কাছে ফিসফিসিয়ে বললাম:

'কিন্তু যদি তুই... ধরে নে, আমরা তোকে মাপ করে দিয়েছি। তবে আশা আছে ফের আমাদের সাক্ষাৎ হবে!'

'আমারও...'

'এবার সবাই বেরো! তবে পা টিপে টিপে! ভাইপোর কানে যেন কিছু না যায়,' হুকুম দিলাম আমি।

শুধু মিরোনভা নয়, অন্য সকলেও সাগ্রহেই আমার হুকুম মেনে নিলে, কেননা সর্বশক্তিতে ভাইপো তখন লোহার দরজায় এমন দুমদাম শুরু করে দিয়েছিল যে মনে হল এই বুঝি দুয়োর ভেঙে বেরয়।

এলোমেলো চুল, পিঠে চেয়ার আর বোতাম ছেঁড়া শার্টে গ্লেব রইল একা।

আমরা পা টিপে টিপে 'পুরনো বাগান বাড়ি' থেকে বেরিয়ে ফের ছুট লাগালাম।

প্রকৃতি ওদিকে তার অপরূপ লীলার আসর বিছিয়ে চলেছিল, তবে সেটা অন্ধকারে। আর হেমন্ত কালের ফাঁকা একটা বসত এলাকার চেয়ে বিষণ্ণ আর কীই বা আছে! তাতে আবার ভর সন্ধ্যায়... বার কয়েক আমি গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়েছি বাগান বাড়িতে। কিন্তু অগস্টের শেষাশেষি যখন একের পর এক বাগান বাড়ি ফাঁকা হয়ে আসে, তখন এলাকাটা হয়ে ওঠে মনমরা, নিঃসঙ্গ। আর এখানে তো এখন গোটা এলাকাটার কোথাও একটি আলো পর্যন্ত নেই! প্রায়ই আমরা খানাখন্দে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম।

ফের আমরা পাইন বনটাকে ঘুরে যেতে শুরু করলাম, দিনের বেলায় এটা ছিল কচি, সুন্দর, কিন্তু এখন হয়ে উঠেছে কালচে, ভুরু-কোঁচকানো, একদিনেই যেন বুড়িয়ে গেছে। দূর থেকে প্রত্যেকটা গাছকেই মনে হচ্ছিল কেমন যেন রহস্যময় মতলববাজ... সকাল বেলা হলে তাতে আমার ভালোই লাগত। এখন কিন্তু এই জল কাদা স্যাঁতস্যাঁতানিতেও কোনো আনন্দ হচ্ছিল না। হঠাৎ বাড়ির জন্যে, গরম ঘরটার জন্যে মন কেমন করে উঠল... তবে এটা শুধু মুহূর্তের দুর্বলতা! আমি তাতে আত্মসমর্পণ করলাম না। ছুড়ে ফেললাম তা, বলা ভালো ঝেড়ে ফেললাম!

'এইটেই সেই আমার গুঁড়িটা, না?' চেঁচিয়ে উঠল মরকুটে, এবং ফের বসল ঠিক মাঝখানটিতে। অন্যদের বসার জায়গা রইল না। এবং আগের মতোই হাঁপাতে লাগল ওর নাক, পেট, কাঁধ — এটা আমি অন্ধকারের মধ্যেও টের পেলাম।

'মহিলাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দে!' বললাম আমি।

'কেন, আমরা কি ট্রামে যাচ্ছি? নাকি ট্রলিবাসে?' ঠাট্টা করলে নাতাশা, 'বনের মধ্যে ভদ্রতা দেখাবার কিছু নেই।'

মরকুটে লাফিয়ে উঠল। নাতাশা কিন্তু বসলে না। মিরোনভাও দাঁড়িয়ে রইল।

'তাতে কিনা আবার কবি!' বললাম মরকুটেকে, 'সুন্দরীদের নিয়ে কবিতা লিখিস!' এবং আস্তে করে যোগ দিলাম, 'যাদের অস্তিত্বই নেই...'

'মরকুটের পেছনে লাগিস না,' বললে মহানুভব প্রিন্স। আগের মতোই ওর ধারণা মরকুটে বুঝি প্রেমে পড়ার সুখ পেয়েছে। আর অন্যের হৃদয়াবেগের প্রতি ওর শ্রদ্ধা অশেষ।

'বেশ, এমন মুহূর্তে নয় ঝগড়া করব না!' বললাম আমি, 'কিন্তু আমাদের গ্লেবের কী হল?'

'আমাদের' বললাম, কারণ কী বিপদের মধ্যে (হয়ত মরণাধিক বিপদ) গ্লেব আছে সেটা কল্পনায় ছিল। আমি তার দোষ, তার অপরাধ ভুলে যেতেও তখন রাজী। ভাবলাম: 'ভাইপো যদি ওকে বিশ্বাস না করে? তলকুঠরি থেকে বেরিয়েই যদি খেপার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় গ্লেবের ওপর? কিংবা যদি তাকে তলকুঠরিতে পুরে বন্ধ করে দেয়?'

হ্যাঁ, গ্লেবকে মার্জনা করতে আমি রাজী, কেননা এই মুহূর্তে আমাদের সকলের জন্যেই সে আত্মত্যাগ করছে!..

'সত্যি, ভাইপোকে ছেড়ে না দিলেও হত,' আস্তে বললাম আমি।

'মানুষের সঙ্গে অমনধারা ব্যবহার কি করা যায়?' বললে নাতাশা।

ঠাণ্ডা বৃষ্টির মধ্যেও ও ন্যায়পরতার কথা ভাবছে!

'ক'টা বেজেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না,' বললে নাতাশা।

'তোর হাতটা দে। আমি দেখছি!'

হাত বাড়িয়ে দিলে সে। অনেকক্ষণ ধরে ঘড়ি দেখলাম আমি।

এর পরেও তিন-চার বার আমি নাতাশার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘড়ি দেখেছি, কেননা অন্ধকারে কাঁটাগুলো ঠিক ঠাহর হচ্ছিল না। তাছাড়া... শেষ পর্যন্ত দুর্ভাবনা শুরু হল আমার। পনেরো মিনিট কেটে গেছে, অথচ এখনো গ্লেবের দেখা নেই।

মনে হল: 'ও নিশ্চয় আত্মাহুতি দিয়ে নিজের দোষ স্খালন করেছে। আর আমি ওর প্রতি সংবেদনশীলতা দেখাই নি... অবশ্য ওর প্রতি রূঢ়তা দেখাই নি, তা ঠিক। তাহলেও ধিক্কার দিয়েছি। আর ও একা, এলোমেলো চুলে চেয়ার বাঁধা পিঠে তলকুঠরিতে ভাইপোর সামনে। সবার এতটা সাহস হত না। যেমন মরকুটে তো কখনোই রাজী হত না। আর আমি নিজে?'

এই শেষ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হল। তাই ও বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আরেকবার নাতাশার ঘড়িটা দেখলাম। বিশ মিনিট কেটে গেছে।

এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার... মনে হল: 'প্রথমত, গ্লেব নিশ্চয় মারা পড়েছে। দ্বিতীয়ত, ট্রেন আসতে বিশেষ দেরি নেই। এবার যদি ট্রেন ফেল করি, তাহলে ঘরে ফিরব কাল সকালে। আর মা-বাবাকে সে কথা জানাব কী ভাবে? কোনো উপায় নেই! টেলিফোন করা যাবে না: ভাইপো ছাড়া পেয়ে গেছে! আমাদের মা-বাপেরা স্রেফ মারা পড়বে। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়... যদিও কারো কারো ক্ষেত্রে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। বিশেষ করে আমাদের মায়েরা! বাবাদের নিয়ে

আমার দুর্ভাবনা কম। কিন্তু রাত কাটাব কোথায়? ভাইপোর আতিথ্য তো আর নেওয়া যায় না! গ্লেবকে ছাড়াই রওনা দেব কি? উঁহুঁ, তা হয় না। কিন্তু কী ভাবে তাকে উদ্ধার করব? কী উপায়ে?!'

'গ্লেবের কিছু একটা বিপদ হয়েছে,' আশঙ্কা চাপা না দিয়েই বললাম আমি।

'আমার জন্যেই,' বললে নাতাশা, 'আমিই দোষী। আমি!..'

বনের মধ্যে, অন্ধকারে, ঠান্ডা বৃষ্টির ভেতর সে ন্যায়পরতার কথাই ভাবছিল!

'আরে না, নিজেকে ফাঁসি দিস না!' বললাম ফিস ফিস করে যাতে আর কারো কানে না যায়।

ভয় বিশেষ চাপা না দিয়েই সে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

'তোর দোষ নেই,' শান্ত স্বাভাবিক গলায় বললাম আমি, 'ভাইপোকে তলকুঠরিতে বন্ধ করে রেখেছিলাম তো আমিই। অবিশ্যি আমার কোনো উপায় ছিল না। তার মানে, কারো দোষ নেই। জীবনই এই রকম!'

'সে ল্যা ভি,' ফরাসী ভাষায় পুনরুক্তি করলে মরকুটে। অন্যের আলাপে নাক গলানো তার অভ্যাস।

এই 'সে ল্যা ভি' কথাটা আমরা প্রথম শ্রেণী থেকেই বলে আসছি। কিন্তু মরকুটে সেটা এমনভাবে উচ্চারণ করলে, যেন ফরাসী ভাষায় সে ওস্তাদ। মানে, 'পুরনো বাগান বাড়ি' থেকে উদ্ধার পেয়ে এখন তার সাহস ফিরেছে।

বললাম, 'পশ্চাদ্ধাবনের সম্ভাবনা এখনো যায় নি।'

সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী ছেড়ে রুশীতে বললে মরকুটে:

'তার মানে?'

'ভাইপো আর কি!.. গ্লেব যখন এখনো ফিরল না, তখন আমাদেরই ওকে খালাস করতে হবে!'

চুপ করে রইল মরকুটে।

আমি ভেবে দেখলাম: 'কী করা যায়? খবর নেবার জন্যে সবাই যাব কি? তাহলে নির্ঘাৎ ট্রেন ফেল করব। হুঁ, হুঁ, হুঁ... তাহলে উপায়? তাহলে নয় আমি একলা থেকে যাই, বাকি সবাই স্টেশনে ছুটুক?'

কথাটা বলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে জবাবের অপেক্ষায় রইলাম: একলা থেকে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না।

'আয় আমরা দুজনে থেকে যাই,' বললে দিনেমার প্রিন্স।

'মেয়েরা যাক,' বললাম আমি, এবং মরকুটের দিকে চেয়ে যোগ করলাম, 'তুই যাবি ওদের সঙ্গে।'

মরকুটে আপত্তি করল না। কিন্তু রাজী হল না নাতাশা:

'এখনো সময় আছে, কয়েক মিনিট... সবুর করা যাক। তোকে আমি একলা ছেড়ে যাব না।'

আমাকে! একলা! যদিও প্রিন্সও থাকতে চেয়েছিল... কিন্তু শুধু আমার কথাই ও বললে! এটা যদি ঠান্ডা বনের মধ্যে না হয়ে অন্য কোনো পরিস্থিতিতে হত, তাহলে নিশ্চয় সুখের

প্রাবল্যে মারা যেতাম। কিন্তু বনে হওয়ায় মারা গেলাম না। যদিও পরের মুহূর্তেই মনে হতে পারত যে আমরা সবাই মারা গেছি। পাঁচ জনেই! কেননা আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে শুনতে লাগলাম কাদার মধ্যে কার যেন পায়ের ছপ ছপ শব্দ উঠছে। বেশ জোরালো শব্দ... হঠাৎ দেখা দিল গ্লেব। বলা ভালো, উদিত হল!

'তোর হাতে ওটা কী?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'জুতো... যাতে হোঁচট না খাই... শীগগির! শীগগির... পেছু নিয়েছে!'

'কোথায়?'

ছুটলাম আমরা!.. তাহলেও দৌড়ের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতেও জিজ্ঞেস করলাম:

'ভাইপো নাকি?'

'হ্যাঁ... খুব ধন্যবাদ...'

'ধন্যবাদ?'

'মানে, হ্যাঁ... খুব চাইছিল... আমায় স্টেশন পর্যন্ত পেঁছিয়ে... বলে, আর ওদের জান নেব!.. তবে আমি... ও যখন রেনকোট পরতে গেছে...'

বরাবরের মতোই গ্লেব তার কথা শেষ করছিল না, কিন্তু এবার বোঝা কঠিন হল না, কতই না তাকে সইতে হয়েছে!

'তাহলেও ও নইলে এ সব কিছুই হত না!' ছুটতে ছুটতেই মনে হল আমার, 'যতই করুক, তদন্ত শেষ করবই। সবটা!..'

গ্লেব এখন আমাদেরই সঙ্গে। ওর জন্যে এখন আর আমার দুশ্চিন্তা নেই। তাই ওর সব কিছু দোষ ভুলে গিয়ে ক্ষমা করার কথা কোথায় হঠাৎ অদৃশ্য হল।

আমার বেলাতে বাড়িতেও এরকম মাঝে মাঝে হয়েছে। মা যদি আমায় বকুনি দিতেন, তাহলে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। নয়ত কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতাম। যখন ফিরতাম, মা ফের তখন আমায় বকুনি দিতেন। দাদা কস্তিয়া আমায় চুপি চুপি বলত: 'তুই যখন ছিলি না, মা তখন ভারি দুশ্চিন্তা করছিল, কত সোহাগ করে তোকে ডাকছিল, তোর সব কিছু মাপ করতে একেবারে রাজী... আর যেই এলি, দুশ্চিন্তা নেই, ফের যে কে সেই। উহ, মেয়েদের বোঝা ভার!' আমি অবিশ্যি মেয়ে নই। কিন্তু আমার সঙ্গে মা যা করতেন, গ্লেবের সঙ্গেও আমার ঠিক তাই হল। সে ল্যা ভি!

এইখানেই আমার ভাবনাটা থেমে গেল। মানে, ছিঁড়ে গেল... কেননা পেছন থেকে শোনা গেল পায়ের শব্দ। থপথপে, ভারি...

'এটা গ্রিগোরি...' দৌড়বার জন্যে, নাকি আতঙ্কে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে গ্লেব, 'ও তোদের... তোকেই প্রথম!.. ও যে বলছিল...'

আমারও সন্দেহ ছিল না যে ভাইপো যা বলেছে তাই করবে। আমাকে খুনই করবে! নয়ত অন্তত মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে...

'ছোট! ছোট!' ফিসফিসিয়ে হুকুম দিলাম আমি, যাতে ভাইপো শুনতে না পায়।

সবার আগে ছুটল মরকুটে: ওর ভয় সবচেয়ে বেশি! তবে আমারও সাহসে কুলোচ্ছিল না।

'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!' প্রাণপণে চিৎকার করলাম আমি। ফিসফিসানির প্রয়োজন ছিল না: ভাইপো নিশ্চয় আমাদের দেখে ফেলেছে। তার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে প্রায় আমাদের পিঠেই।

ফিরে তাকালাম আমি। হ্যাঁ, ও-ই বটে! ভাইপো!.. প্রকাণ্ড অন্ধকার মূর্তিটা কাছিয়ে আসছে প্রতি সেকেন্ডেই...

'সবারই দফা রফা! ওর সঙ্গে পেরে উঠব না আমরা,' মাথায় ঝলক দিয়ে উঠল ভাবনাটা, 'আর যদি লড়াই বাধে এবং হঠাৎ আমরাই জিতে যাই, তাহলেও ট্রেন ততক্ষণে ছেড়ে দেবে... না, জিততে আমরা পারব না! মেয়েদের আর মরকুটের ওপর ভরসা করা চলে না। রইলাম আমরা তিন জন — গ্লেব, প্রিন্স আর আমি। কিন্তু গ্লেব ঠিক কী করবে এখনো বলা যায় না! এ সব তো ওরই কীর্তি, ওর!.. সবই ওর জন্যে। তার মানে, লড়াইয়ে হয়ত নামব আমি আর প্রিন্স, দুজন... নাতাশা নিশ্চয় আমার সাহায্যে ছুটে আসবে। কিন্তু সেটা আমি হতে দেব না। চেঁচিয়ে উঠব: 'এক্ষুণি ছোট!' নিজের দেহ দিয়ে ভাইপোর পথ আটকাব!'

এই সব ভাবনাই মাথায় খেলে গেল প্রায় মুহূর্তের মধ্যে। পশ্চাদ্ধাবনের পদশব্দ তখন একেবারে কাছে... একেবারেই কাছে! সেই সঙ্গে পিঠ জ্বালিয়ে দেওয়া ভাইপোর গরম নিঃশ্বাস... এইবার! এইবার মরণ! আমার সমস্ত চেষ্টা আর বুদ্ধিতে কোনো কাজই হল না। শুধু আর একটি পদক্ষেপ... কেবল একটি! ভয়ঙ্কর ভারী একটি পদক্ষেপ... সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পাল্লা ধরে ফেলবে! ধরে ফেলল!..

'ট্রেন ফেল করব নাকি?' পাশেই শোনা গেল এক উদ্বিগ্ন পুরুষালী কণ্ঠস্বর।

মাথা ঘোরালাম আমি এবং দেখলাম (পেছনে নয়, একেবারে পাশেই!) লম্বা একজন লোক, গায়ে রেনকোট, হাতে পোর্টফোলিও।

'ট্রেন ছেড়ে দেবে নাকি?' ফের জিজ্ঞাসা করল সে।

'তাই নাকি?' বললাম আমি। লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতেও তখন আমি রাজী।

'দেখলাম তোমরা ছুটছো, আমিও ছুটলাম, যদিও ছোটা পোষায় না, বুক ধড়ফড় করে...'

'নিশ্চয় বুকের অসুখ আছে, নাতাশার মায়ের মতো...' ভাবলাম আমি। ভারি ভালো লেগে গেল রেনকোট-পরা এই অচেনা লোকটাকে, দারুণ ভালো!

১২শ পরিচ্ছেদ

সবচেয়ে ছোটো ও সর্বশেষ পরিচ্ছেদ (এই কাহিনীতে!)

অমোঘ গতিতে একদিক থেকে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল ট্রেন, অন্যদিক থেকে আমরা।

'ট্রেন যদি ধরতে পারি তাহলে আমাদের সবারই মা-বাপ বেঁচে যাবে একেবারে আক্ষরিক ও আলঙ্কারিক অর্থে! তাহলে আমার সমস্ত ফন্দি, ফিকির, আন্দাজ, সন্দেহ, যন্ত্রণা খুব একটা নিরর্থক হবে না!' এই কথা ভাবতে ভাবতেই ছুটে এলাম প্ল্যাটফর্মে।

নিয়তির এমনই নির্বন্ধ যে ট্রেনটাও ঠিক সেই সময়েই এসে থামল।

'বসে পড়!' চ্যাঁচাল গ্লেব, 'আমি টিকিট...'

'দরকার নেই!' বললাম আমি।

'বরং আমাদের সবাই জরিমানাই দেব, কিন্তু মা-বাপেরা তো নিশ্চিন্ত হবে!' ভাবনাটা আমার মনে এসে গিয়েছিল, কিন্তু গ্লেবকে তা বোঝানো গেল না, কেননা ততক্ষণে সে টিকিট ঘরের জানলার দিকে ছুটেছে। আরো একটা বীরকীর্তি দেখাতে চাইছিল সে: দোষ লাঘব করার মতো ঘটনাচক্র যে ওর দরকার!

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গোটা ট্রেনটা দেখে নিল। কেউ নামল না, আমরা ছাড়া ওঠার লোকও কেউ নেই। রেনকোট-পরা লোকটা যাবে আপ ট্রেনে, খামোকাই দৌড়ল সে।

শেষ ওয়াগন থেকে গার্ড মেয়েটি সবুজ বাতি দোলালে: অর্থাৎ ট্রেন ছাড়া চলবে। মানে, তার বিবেচনায়...

করা যায় কী? ওয়াগনে লাফিয়ে উঠব? গ্লেবকে ছাড়াই? এবং লাফিয়ে উঠল মরকুটে। বাকি সবাই বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত। মরকুটে মুখ বাড়িয়ে সখেদে তাকাল আমাদের দিকে।

'কেন, এ আর ভাববার কী আছে? এক্ষুনি যে ছেড়ে দেবে...'

অথচ গ্লেব তখনো কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েই আছে টিকিট ঘরের সামনে।

অটোমেটিক দরজাগুলো থেকে ফোঁস ফোঁস শব্দ হল, যেন আমাদের জন্যে সহানুভূতির একটা নিঃশ্বাস। তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ হতে লাগল। মরকুটে তখনও মাথা বাড়িয়ে আছে, মনে হল দু' দিক থেকে এগিয়ে আসা দরজায় বুঝি তা এক্ষুনি আটকে যাবে।

মুহূর্তের মধ্যে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হুঁশিয়ার! বাচ্চা ছেলে!' জানতাম যে 'হুঁশিয়ার! বাচ্চা ছেলে!' কথাটায় খুব ঝটপট কাজ হয়।

দরজার পাল্লায় মরকুটের মুণ্ডু আটকাতে না আটকাতে তা আবার ধীরে ধীরে খুলে গেল।

'কোথায় বাচ্চা?!' রেগে সভয় দৃষ্টিতে চিৎকার করলে ড্রাইভার।

'ও-ই ও-খানে!' অনিশ্চিতের মতো উত্তর দিলাম আমি। জানতাম যে সময় অমোঘভাবে আমাদের পক্ষে।

'কিন্তু কোথায়?'

'ওই—যে!' মরকুটের মনমরা মুখটার দিকে ইঙ্গিত করলাম, তখনো সে গলা বাড়িয়েই ছিল।

'আমি ভাবছিলাম বুঝি চাকার তলে...'

'অনেক ধন্যবাদ!' বললাম আমি ড্রাইভারকে, কেননা প্রয়োজনীয় সময়টুকু ততক্ষণে জিতে গেছি, গ্লেব ছুটে এসেছে টিকিট নিয়ে।

ল্যাফিয়ে উঠলাম সবাই ওয়াগনে! দ্বয়োরগ্বলো যেন আমাদের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ও বন্ধ হল... শেষ পর্যন্ত রওনা দেওয়া গেল শহরে, বাড়িম্বখো!

শেষ ট্রেনটা ধরতে পেরেছি আমরা! বেঁচে গেল আমাদের মা-বাবারা। ন্যায়সঙ্গত গৌরববোধে ব্বক আমার ভরে উঠল।

'এই নে... টিকিট!... কিনলাম...' আমার পাশে বসে বললে গ্লেব।

'অত সস্তায় দোষ কাটাবি বলে ভাবছিস নাকি?' বললাম ফিসফিসিয়ে।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই আফসোস হল: তদন্ত যে এখনো শেষ হয় নি। তার মানে, কোনোরকম গালিগালাজ চলবে না! সবটা প্বরোপ্বরি ফাঁস করতে হবে। এবং সেটা জ্বল্বমবাজি বাদ দিয়ে, ভদ্রতা সহকারে!

কামরাটা ছিল ফাঁকা... বসলাম একেবারে শেষ দিকের বেঞ্চিতে, ডাকলাম:

'গ্লেব, যদি চাস আয় না এখানে। অবিশ্যি যদি চাস...'

ও এসে ফের বসলে আমার পাশে।

'না, না, সামনাসামনি বস: তোর ম্বখটা আমার দেখা চাই। এবার উদ্দেশ্যের ব্যাপার...'

'কীসের?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে গ্লেব। বসল সামনাসামনি।

'অপরাধের উদ্দেশ্য।'

'পরে তুই সব নাতাশাকে...'

'কক্ষনো না! কাউকে বলব না! একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস!'

'না, বরং ওর... আমি চাই নি যে ওর মা... আমি অন্য উদ্দেশ্যে।' হঠাৎ গ্লেব জোরে, প্রায় ট্রেন ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'নাতাশা!..'

নাতাশা এসে বসল তার কাছে।

'আমি ভেবেছিলাম সব গোপনে খোলসা করে নেব। কিন্তু গ্লেব চায় যে তুই-ও শ্বনিস...'

'কী শ্বনব?'

গ্লেবের ওপর আমার আর কোনো রাগ ছিল না: তলকুঠরিতে আমি যা যা আবিষ্কার করেছি, ফাঁস করেছি, আন্দাজ করেছি — সে সব কথাই নাতাশাকে শোনাবার স্বযোগ সে আমায় দিলে। এবং সে সব কথাই বললাম আমি... ও নিজেই তো আমায় বলতে বলেছিল!

'এবার পরের ব্যাপারটা,' বললাম আমি, 'তার মানে, সাব্যস্ত হল যে, নিনেল ফোন করে নি। একা একা আমাদের এখানে আসার অন্বমতি দেয় নি। তাহলে ফোন করল কে? তাড়াহ্বড়ো করিস নে। ভালো করে ভেবে বল!'

'আমার মাসতুতো বোন,' প্রায় ফিস ফিস করে কব্বল করলে গ্লেব।

'বটে!.. তার মানে, এই জন্যেই তুই নিনেলের রোগ হিশেবে সর্দিজ্বরটাই বেছেছিস: গলায় ব্যথা, ভাঙা স্বর, কেউ ধরতে পারবে না। ব্বঝলাম... কিন্তু ওকে বাদ দিয়েই আমাদের এখানে টেনে আনার দরকারটা তোর পড়ল কীসে? যাতে সবাই ভাবে নিনেল যাবার মত দিয়েছে? তাড়াহ্বড়ো করিস নে। সত্য, কেবল সত্য! সত্য ছাড়া কিছ্বই নয়!..'

'মা আমায় জনক-জননী সভার কথা বলেছিল... সেখানে কিছু কিছু লোক... নিনেল আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছিল বলে... মানে, একা একা স্টেডিয়মে যাওয়া আর কি... বলেছিল, আবার যদি এরকম...'

'দাঁড়া!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, কেননা ভয় হল গ্লেব আবার নিজেই সবটা বলে বসে তদন্তের সুযোগ না দেয়।

সে সময় আমার অনুমানশক্তি এমনই প্রখর হয়ে উঠেছিল যে বলবার নয়! নিজেই আমি গ্লেবের কাহিনীটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ করে দেখাতে পারতাম যে আমার ডিটেকটিভ নামটা অসার্থক নয়।

সগৌরবে বললাম, 'এবার আমার কথা শোন! তদন্তের ফল একেবারে পরিষ্কার। অবশ্য সবকিছুতেই আমার সন্দেহ করা উচিত, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনোই সন্দেহ নেই... ঘটনাটা ঠিক আমি যা বলব তাই ঘটেছিল! একেবারে তাই! তুই গ্লেব ঠিক করলি: নিনেল যদি আরেকবার আমাদের স্বাধীনতা দেয় (তাও আবার কেমন, একা একা শহরের বাইরে যাওয়া!), তাহলে মা-বাপেরা ওকে আমাদের স্কুল থেকে তাড়াবে। কেননা নিনেলের বয়স কম, দেখতে সুন্দর, অভিজ্ঞতা নেই, ইত্যাদি। এবার পরের ঘটনা! সবাই আমরা শুনলাম যে নিনেল ফোন করছে। যদিও ফোন করছিল তোর মাসতুতো বোন... আর নিনেল যদি প্রমাণও করত যে সে ফোন করে নি, তাহলেও সবাই তাকে বলত: 'আপনি ওদের স্বাধীনতা নেবার শিক্ষা দিয়েছেন, এই তার ফল!' আমাদের মা-বাপেদের আমরা ভালোই চিনি! মোটের ওপর, তোর উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত মা-বাপকেই ভাবনায় ফেলা! এই তাহলে দাঁড়াচ্ছে... একেবারে জলজ্যান্ত অপরাধ! তুই চেয়েছিলি, যাতে আমরা ট্রেন ফেল করি, ভাইপোকে বলেছিলি আমাদের তলকুঠরিতে বন্ধ করে রাখতে। আর পরের ট্রেন শুধু এইটে। ফিরব আমরা প্রায় মাঝরাতে... মা-বাপে আতঙ্কে মরবে! নিনেল বরখাস্ত। আর তোর একেবারে পোয়াবারো: ফের তোর দাদুর নামে বসবে সাহিত্য চক্র, দাদুর নামে প্রদর্শনী... ফের হয়ে দাঁড়াবি চক্রের সম্মানী সদস্য! মোট কথা, ক্লাসের... বলতে কি স্কুলের সবচেয়ে নামকরা।'

গ্লেব চুপ করে রইল। তদন্ত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং এবার যা বলা যেতে পারে তা বললাম:

'এটা একেবারে পাষণ্ডতা!'

মাথা নাড়লে নাতাশা।

'ওর কিন্তু তত দোষ নেই।'

'ওর?!'

'নিশ্চয়... গ্লেব আগে ছিল একেবারেই অন্য লোক। তারপর ওকে যা শেখানো হয়েছে, আমরা নিজেরাই শিখিয়েছি, তা আর ও না করতে পারে না। ওর সখ ছিল কুকুর। কিন্তু আমরাই ওকে জোর করে কুকুরের নেশা ছাড়িয়ে অন্য ভার চাপিয়েছি...'

'ওহ, কী আমার দয়ালু রে!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

ফাঁকা কামরায় কথাটা কানে গেল সবার। সবাই ফিরে তাকাল। হাত তুললে মিরোনভা। আমি কিন্তু ওকে বলতে দিলাম না।

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার...' আস্তে করে বললে নাতাশা, যাতে আমাদের তিন জন ছাড়া আর কেউ না শোনে।

'তা আবার নয়! ক'ঘণ্টা বসেছিলাম তলকুঠরিতে!'

'সেটা তেমন ভয়ঙ্কর নয়।'

'সেটা নয়? তাহলে কোনটা ভয়ঙ্কর?'

'যখন বিনা কারণে লোককে তারিফ করা হয়!'

'কিন্তু নিনেলের কী হবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'কিছু কিছু মা-বাপে তো নির্ঘাৎ সোরগোল তুলবে: 'স্বাধীনতা দিয়েছে, দেখো তার ফল: মাঝরাতে ফিরল!' যেমন মরকুটের মা...'

'মা-বাপের ভার আমরা নিজেরা নেব,' বললে নাতাশা, 'বোঝাব! মা-বাপের জন্যে ছেলেমেয়েদেরই তো ভার নিতে হবে।'

খুব চমৎকার কথা এটা। তাহলেও গ্লেবের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম:

'তদন্ত শেষ হয়েছে। অপরাধ সাব্যস্ত হয়েছে। আইন অনুসারে এবার আদালতে সোপর্দ করা উচিত।'

একান্ত বিচলিত হয়ে উঠল গ্লেব। মুখ তার লাল হয়ে উঠল, তবে সমানভাবে নয়, মখমলের মতো নয়, দাগড়া দাগড়া, স্নায়বিক। কাঁধ তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে বুঝলাম যে ও এখনি চেঁচিয়ে উঠবে, মানে কঁকিয়ে উঠবে।

বললাম, 'চোখের জলে দুঃখ ঘোচে না, প্রবচনে তাই বলে!'

নাতাশা বললে, 'গ্লেব আমাদের দুঃখ ঘুচিয়েছে চোখের জলে নয়, একা ওই তো তলকুঠরিতে ভাইপোর কাছে গিয়েছিল, ভাইপো তো ওকে... একথা ভুলছিস কী করে আলিক? এটা তো তোরই বুদ্ধি...'

নাতাশা আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইলে যা আমার স্বপ্নেরও অগোচর! সে দৃষ্টিতে ছিল কৃতজ্ঞতা। হয়ত বা আরো কিছু... কিংবা হয়ত সেটা আমার মাত্র মনে হয়েছিল।

'তোর যা মর্জি!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'ওকে মাপ করতে চাস?'

'না, না... তা বলছি না। তবে তোকে অন্তত এই কথা বলব: বোকা দুবলা লোক যদি নিষ্ঠুর হয়, তবে সেটা বিছছিরি ব্যাপার। আর যদি বুদ্ধিমান সাহসী লোকে নিষ্ঠুর হয়, তবে সেটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তেমন লোককে হতে হবে দয়ালু।'

'সাহসী, বুদ্ধিমান!'

ওর মুখ থেকে একথা শোনার জন্যে আমি ক্লাসে না গিয়ে তলকুঠরিতে তিন দিন তিন রাত্রি কাটাতেও রাজী। এমন কি হাফ টার্ম পরীক্ষা পর্যন্তও!

পুনশ্চ

নিয়তির এমনি নির্বন্ধ যে আমার প্রথম ডিটেকটিভ কাহিনীর শেষ এইখানেই। তবে এইটেই যে শেষ কাহিনী নয়, সেটা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতেই টের পাচ্ছি!..

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union